জ্যৈষ্ঠ
শিশু সাথী
১৩৭৩

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুস্মিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো অপ্রকাশিত পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শিশুসাথীর নিয়মাবলী

১। শিশুসাথীর চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক—৫৲, ষাণ্মাসিক—২·৫০। প্রতি সংখ্যা ·৫০ নয়া পয়সা। **চাঁদার টাকা—"বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫নং বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। **শিশুসাথীর বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়।** যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। **পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।** পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকার পত্রিকা ডাকে পাঠান হয়। ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ·৫০ নয়া পয়সা হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইলে রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে। কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা প্রত্যেক চিঠি-পত্রে **নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্য উল্লেখ করিবেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে

৭। **লেখক-লেখিকা** এবং **গ্রাহক-গ্রাহিকাদের** লেখা, উহাদের তোলা ফটো এবং আঁকা ছবি সম্পাদিকার মনোনীত হইলে প্রকাশ করা হয়; তবে যে-কোন লেখা বা ছবি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। **লেখা বা ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকেট না পাঠাইলে ফলাফল জানান হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার,** কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। **কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই।** যে-কোন লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং খামের উপর বিভাগের নাম লিখিয়া দিলে সুবিধা হইবে। "শিশুসাথী" সম্বন্ধে যে-কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাক-টিকেট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'** ; ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

ফোন : ৩৪-১৫৬৪

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৪৫শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

শিশুসাথী

জ্যৈষ্ঠ
১৩৭৩

বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা]

সূচী

[প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	জষ্টি এল (কবিতা)	শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ	৭১
২।	অমিয় বনাম বিজন	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৭২
৩।	সাগরের নীচে যা আছে	শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৭
৪।	মাতৃ-ভক্তি (কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৭৮
৫।	কুপকুপ	গৌরী চৌধুরী	৮০
৬।	একজন চালাকের গল্প	ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী	৯৩
৭।	একটি প্রতিভা	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস	১০১
৮।	বরফের দেশ	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	১০৪
৯।	নতুন বছরে (কবিতা)	শ্রীঅতীন মজুমদার	১০৯
১০।	জাপানের চিঠি	পি. সি. সরকার	১১০
১১।	ছড়া		
	হাট্টিমা টিম পাখী	সাজ্জাদ উদ্‌দীন আহ্‌মদ	১১৩
১২।	তোমাদের পাতা		
	(১) এক রাতের ভূত	করবী গুপ্ত	১১৪
	(২) ভোর হয়েছে (কবিতা)	মৃগেন্দ্রকুমার বেরা	১১৭
	(৩) জিভকাটা চড়ুইটি	ছন্দা দিন্দা	১১৮
১৩।	কুয়েলালামপুরের ডলার পোড়ানোর যাদু	যাদুকর এ. সি. সরকার	১২০
১৪।	বিদেশী গল্পগুচ্ছ	শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা	১২২
১৫।	বিজ্ঞান-পত্র	সঞ্জয়	১৩০
১৬।	শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	১৩৩
১৭।	খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১৩৫
১৮।	কবিতার ধাঁধা	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	১৩৭
১৯।	সম্পাদিকার চিঠি		১৩৮

গ্লুকোজ দিয়ে তৈরী

Lord's

লর্ডের
লজেন্স ও টফি

জেম্‌স্ লর্ড এণ্ড সন্স লিঃ কলিকাতা-১

খোকনের জন্য

শিশুর কোমল ত্বক, ঘামাচি, চুলকনা প্রভৃতি চর্ম রোগের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য 'পার্ল পাউডার' অদ্বিতীয়। ইহার স্নিগ্ধ সুগন্ধ, সূক্ষ্ম রেণু খোকনের গা কোমল ও মসৃণ রাখবে এবং তা'র মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

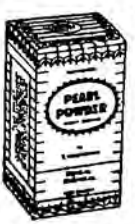

পার্ল পাউডার

পরাগকোমল
প্রসাধন রেণু
শিশুদের কোমল
ত্বকের জন্য

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

জাতীয় জীবনে
শারীর-বিদ্যাচর্চার গুরুত্ব

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুব-কল্যাণ কর্মসূচির গুরুত্ব যে অনেকখানি সে-কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। কারণ, সুস্থ-সবল যুবক-যুবতীরাই দেশের প্রকৃত লোক-শক্তি, দেশের উন্নয়নমূলক কাজে এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তাঁরাই হলেন দেশের আশা ও ভরসা।

পশ্চিমবংগের শিক্ষা-দপ্তর থেকে যুব-কল্যাণমূলক যে-সব কর্মসূচি অনুসৃত হয়ে থাকে, তা হ'লো ঃ

(ক) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে—

১। শারীর-বিদ্যা অনুশীলন ; ২। বিভিন্ন রকমের খেলাধূলায় আন্তঃ স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি-যোগিতা ; ৩। বিভিন্ন রকমের খেলাধূলায় স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপের ব্যবস্থা ; ৪। স্বাস্থ্য পরিদর্শন ; ৫। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ৬। শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ।

(খ) বিভিন্ন ক্লাব, সমিতি, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার সদস্য বা কর্মীদের ক্ষেত্রে—

১। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ; ২। গোষ্ঠীবদ্ধ ভ্রমণ ও পর্বতারোহণ ; ৩। যুব-উৎসব প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং ৪। আন্তঃ-জেলা বা আন্তঃ-রাজ্য ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য সাহায্য। এ-ছাড়া ইউথ-হস্টেলে অবসর-যাপন ও শিবির-বাসের ব্যবস্থাও করা হয়।

॥ শারীর-বিদ্যা অনুশীলনের মাধ্যমেই গ'ড়ে উঠছে পশ্চিমবংগের যুবশক্তি ॥

—ডব্লিউ. বি. (আই. অ্যাণ্ড পি. আর) এ. ডি. ভি-ডি ৬৮৮৯/৬৬—

আমি,
তুতুল,
দিপু-

আমাদের সকলেরই ভালো লাগে—

মার্গো সোপ এর প্রচুর নরম ফেনা কোমল চামড়ার পক্ষে সত্যিই খুব ভাল।

নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহারে দাঁত ঝক্‌ঝকে ও মাড়ী শক্ত হয় এবং দাঁতের অসুখ হয় না।

ক্যাষ্টরল মাথায় মেখে স্নান করলে কি আরাম। তাছাড়া মাথায় কত চুল হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

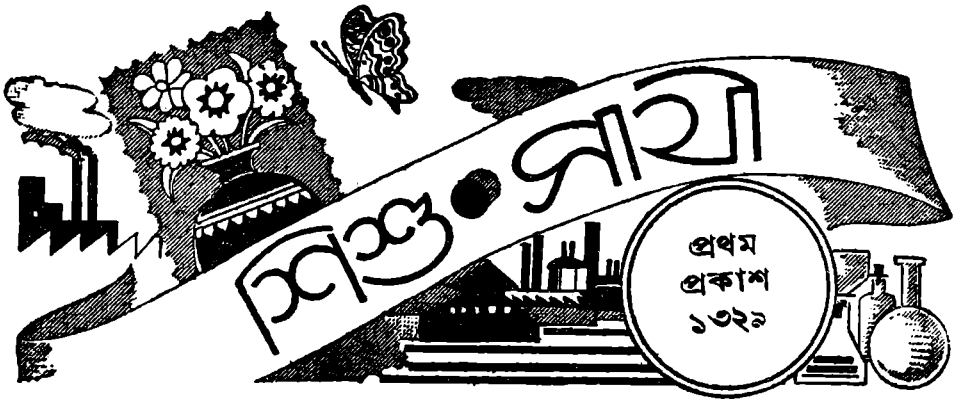

৪৫শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩ | ২য় সংখ্যা

জষ্টি এল

॥ শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ ॥

জষ্টি এল রুদ্ররূপে আগুন-ঝরা রথে,
তপ্ত বালু শুষ্ক তৃণ ছড়ান তার পথে।
ঘূর্ণি হাওয়া উড়িয়ে ধুলো,
আনন্দে আজ ছড়িয়ে দিল ;
ডাকল ঘুঘু উদাস সুরে বৃক্ষ-চূড়া হতে।

জষ্টি এল ভীষণ গরম প্রাণ বাঁচান দায়,
গাছের শীতল ছায়ার নীচে মন যে যেতে চায়।
নদী-নালা শুকিয়ে গেল,
চাতক ডেকে আকুল হল ;
শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিল তপ্ত পাগল বায়।

জষ্টি এল আম-কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে,
ছেলে বুড়ো সবার প্রাণে খুশির সাড়া দিয়ে।
সাঁতার কাটে দীঘির জলে,
পাড়ার যত ছেলের দলে।
ঈশান কোণে ডাক দেয় কে বিষাণ বাজিয়ে?

জষ্টি এল ভরসা দিল ঐ যে আষাঢ় আসে,
আবার নবীন প্রাণের সাড়া জাগবে ঘাসে ঘাসে।
তপ্ত ধরা শীতল হবে,
খুশির সাড়া জাগবে ভবে।
কানন আবার ভরবে ফুলের মধুর সুবাসে।

অমিয় বনাম বিজন

॥ শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ॥

নতুন ইস্কুলে এসে অমিয় কোণঠাসা হয়ে গেলো।

এর একমাত্র কারণ সে ভাল খেলতে পারে। স্কুল-লীগের খেলায় তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো, সেই সুযোগে সে খেলা দেখিয়ে দিয়েছে। গোড়ার দিকেই পর পর দুখানা গোল 'স্কোর' করেছে। সবাই বলেছে 'ড্রিবলিং ও এংগেল্ কট্-এ অমিয় অদ্বিতীয়'। একদিনের খেলাতেই এতটা সুনাম বিজন সইতে পারে নি। দু বছর পর পর ইস্কুলের সেরা খেলোয়াড়ের মেডেল সে পেয়েছে, এবার অমিয়র জন্যে সেটা ফস্কে যাবে ?

বিজন ক্লাসের ক্যাপটেন। সবাই তাকে খুশি রাখতে চায়, খেলায় 'চ্যান্স্' পাবার জন্য বিজন যার উপর বিরক্ত, সবাই তার উপর বিরক্ত। কাজেই অমিয় কোণঠাসা।

পরের খেলায় বিজন অমিয়কে সুযোগ দেয় নি, খেলা 'ড্র' হয়েছে। ক্লাস-টীচার পরাণবাবু বললেন, অমিয়কে নামালে তোমরা নিশ্চয়ই জিততে।

বিজন মনে মনে আরো ক্ষেপে গেলো। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ খেলায় অমিয়কে নামাতে হলো। দুটোতেই এক জোড়া গোল দিয়ে অমিয় ক্লাস-টীমকে জিতিয়ে দিলো। পরাণবাবু খেলাধূলা ভালবাসেন, বললেন—এবার শেষ অবধি অমিয়কে নিয়ে খেলো, তা হলে ইস্কুল-লীগ তোমরাই পাবে।

বিজন মনে মনে ফুঁষে উঠলো।

তার উপর ক্লাসের বিদ্যুৎ, নিতাই, শংকরও বললো—সত্যি ওর খেলার ধরণটা ভারী চমৎকার, বল নিয়ে ও যা খুশি করতে পারে, বলটা যেন ওর পায়ের সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকানো থাকে।

আগুনে ঘি পড়লো, অমিয়কে অপদস্থ করার জন্য বিজন সুযোগ খুঁজতে লাগলো। অমিয় যত ভাল খেলোয়াড়ই হোক বিজন যে অমিয়র অনেক উপরে সেটা সে দেখিয়ে দেবে। আড়ালে অমিয়কে সে বিদ্রূপ করে বলে—ও মিঞা!

অমিয়কে ক্লাসশুদ্ধ ছেলে এখন 'মিঞা' বলতে শুরু করেছে।

অমিয় শোনে, চুপ করে থাকে।

সেদিন খেলার মাঠে অমিয় বিজনকে জব্দে ফেললো। যত বল আসে সবই বিজনকে সে

ঠেলে দেয়। বিপক্ষের গোলের মুখে তিনটে বল পেয়েও বিজন গোল করতে পারলো না। খেলার শেষে পরাণবাবু বললেন—বিজনটা একেবারে স্বার্থ, অমিয়র দেওয়া সব বল সে নষ্ট করলো। অমিয়, তুই নিজে গোলে শট করলি না কেন?

—আমার যে পায়ে ব্যথা!—অমিয় মিথ্যা করেই বললো।

—পায়ে ব্যথা? বেশ, আজ না হয় ড্র হলো, কাল জিতবি কি করে?

—ব্যথা বাড়লে কাল আমি নামবো না।

—সেমি ফাইন্যাল খেলায় তুই না থাকলে তোরা হারবি।

—কেন, বিজনকে একটু ভাল করে খেলতে বলুন না!

—ও যত ভালই খেলুক, তোকে নামতেই হবে।

—যদি পায়ের ব্যথা আরও বাড়ে স্যার?

—তুই চল, আমি তোকে এখনি একটা আইওডেক্স্ কিনে দিচ্ছি। আজ একবার, আর কাল দুবার মালিশ করলেই ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক খেলতে পারবি।

মাঠ থেকে ফেরার মুখে পরাণবাবু এক ডাক্তারখানা থেকে মলমটা কিনে দিলেন অমিয়কে। বিজনের মন করকর করে উঠলো, পরাণবাবু এমন খাতির তো তাকে কখনও করেন নি।

পরাণবাবু বাড়ীর পথ ধরলেন, এরাও ফিরলো নিজেদের বাড়ীর দিকে। পথ সংক্ষেপ করার জন্য দীঘির পাড় দিয়ে তারা আসছিলো। হঠাৎ অমিয়র পায়ে একটা হোঁচট লাগলো, অমিয় পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেলো। ঠিক সেই সময় বিজনের মাথায় কি দুষ্টবুদ্ধি জাগলো, বিজন অমিয়কে ধরতে গিয়ে একখানা পা বাড়িয়ে পায়ে পায়ে বাধিয়ে দিলো, অমিয় আর সামলাতে পারলো না, একেবারে জলে গিয়ে পড়লো। সেখানে প্রায় এক বুক জল, অমিয়র জামা-কাপড় সব ভিজে গেলো। বিজন বলে উঠলো—শুকনো ডাঙ্গায় টলে পড়ছিস!

অমিয় জল থেকে উঠে এলো।

বিজন বললো—কাপড়-জামা ভিজুক, মলমটাও ভিজে গেলো, এই দুঃখ—ঝাঁঝ কমে যাবে!

—তুই তো লেংগি মেরে ফেলে দিলি।—অমিয় বললো।

—কাল পরাণ স্যারের কাছে নালিশ করিস, আজ এখন ভিজে বেড়াল হয়ে বাড়ী যা।

পিছন থেকে কে এজকন ডেকে উঠলো—মিঞা!

অমিয় জামাটা খুলে নিংড়ে নিচ্ছিলো, আরেকজন বলে উঠলো—ভিজে বেড়াল!

মলমটা পকেট থেকে বের করে অমিয় বলাইর হাতে দিয়েছিলো।

বিজন মলমটা তার হাত থেকে নিয়ে বললো—মলমটা ভিজে গিয়ে ভালই হয়েছে, ভিজে বেড়ালের গায় ভিজে মলম ডবল কাজ করবে।

হাতের জামাটা ফেলে দিয়ে অমিয় রুখে দাঁড়ালো,—কী!

বিজনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস ইস্কুলের কারও ছিলো না। গতবারে বক্সিং করে ছাত্রদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, এই বেলায় সে এখন সেরা বক্সার, সবাই তাকে ভয় করে। অনেকে নাক থেবড়ে যাবার ভয়ে তার অনেক অত্যাচার সহ্য করে। তার সঙ্গে রুখে এলো অমিয়।

বিজন মলমটা বলাইর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো—কি, মারামারি করবি?

সঙ্গে সঙ্গে অমিয় এক ঘুসি বসিয়ে দিলো বিজনের মুখে।

বিজন ঝাঁপিয়ে পড়লো অমিয়র উপর। অমিয় তার ঘুসি এড়িয়ে এক পা এক পা করে পিছুতে লাগলো। যত ঘুসি ফস্কে যায় বিজন তত রেগে যায়। শেষে হন্তে হয়ে উঠলো। অমিয় তখন জলের কিণারা বরাবর গিয়ে পড়েছে। বিজন যেই আরেকটা ঘুসি মারার ঝোঁক দিয়েছে, অমিয় টুপ্ করে একপাশে বসে পড়েই পায়ে মারলো ধাক্কা। অমিয়র মাথা টপকে বিজন গিয়ে পড়লো জলে।

ছেলের দল হৈ-হৈ করে উঠলো, এ একটা অভাবিত ব্যাপার!

অমিয় জামা ও মলম নিলো, তারপর বিজনের পানে তাকিয়ে বললো—শোধবোধ। চললাম।

বিজন তখন জল থেকে উঠছে, বললো—বেশ, আমিও এর শোধ নেবো।

বলাই বললো—তুই তো ওকে আগে জলে ফেলেছিস, এর আবার শোধ কি?

বিজন কট্‌মট্ করে বলাইর পানে তাকালো।

শংকর বললো—অমন করে দেখছিস কি? তোর মুরোদ বোঝা গেছে। এখন ভিজে জামাটা খুলে বাড়ী চল।

বিজন বললো—আমি ওর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবো।

শংকর বললো—তা তো করবিই, খেলায় পারবিনে, পড়ায় পারবিনে, এখন করবি গুণ্ডামি।

বিজন গুম্ হয়ে গেলো।

সেইদিন থেকে বিজনের দল ভাঙলো, যারা বিজনের অনেক অত্যাচাব সয়েছে, তারা খুশি হলো, অমিয়কে বললো—রীতিমত টাইট করে দিয়েছিস, বড্ড বেড়ে উঠেছিলো।

এদিকে অমিয়র সঙ্গে বিজন কথা বন্ধ করে দিলো।

তা কথা বন্ধ থাকলেও খেলায় অমিয়র নাম রাখতে হয়। সেখানে পরাণবাবু আছেন।

খেলায় অমিয় অদ্বিতীয়। ফাইন্যাল খেলার 'বেস্ট প্লেয়ার' মেডেল অমিয় পেলো। হেডমাস্টার বললেন—ইস্কুল টীমে এবার অমিয় ক্যাপটেন হবে।

বিজন আরও জ্বলতে লাগলো। কি করে অমিয়কে জব্দ করা যায় সেই কথাই বিজন ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে খেলার মাঠ থেকে অন্যমনস্কভাবে সে একাই বাড়ী ফিরলো।

ঘোষেদের দুষ্ট গরুটা দড়ি ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলো। সামনে বিজনকে দেখেই তাকে ঢুঁশিয়ে ফেলে দিলো, তারপর দিলো দৌড়। আচম্‌কা আঘাত পেয়ে বিজন পথে পড়ে জ্ঞান হারালো।

অমিয়ও বাড়ী ফিরছিলো, এমন সময় একটা ছেলে এসে বললো—বিজনকে গরুতে গুঁতিয়ে দিয়েছে, পথে পড়ে আছে।

—কোথায়?···অমিয় জিজ্ঞাসা করলো।

তারপরেই ছেলেটির সঙ্গে ছুটলো।

অমিয় গিয়ে যখন বিজনকে তুললো, তখনও বিজনের জ্ঞান হয়নি, উরুর খানিকটা জায়গা কেটে রক্ত ঝরছে।

চোখে মুখে জল দিতে বিজনের জ্ঞান হলো। অমিয় বললো—উঠতে পারবি? আমি ধরছি।

বিজন ধীরে ধীরে ওঠার চেষ্টা করলো, তারপর বললো—পায়ে জোর পাচ্ছি না।

সঙ্গে আরো দু-তিনজন ছিলো, অমিয় বললো—একখানা সাইকেল রিক্সা ডাক, হাসপাতালে যেতে হবে। বোধ হয় পা ভেঙে গেছে।

—আগে বাড়ীতে নিয়ে চল না।

—না, আগে ডাক্তারখানায় যেতে হবে, তোরা কেউ বাড়ীতে খবরটা দিস।

—হাসপাতাল তো চারমাইল দূরে, দু টাকা ভাড়া চাইবে।

—দেবো ভাড়া, তুই ডাক।

একজন সাইকেল রিক্সা ডেকে আনলো। ভাড়া হলো দেড় টাকা। অমিয় বিজনকে নিয়ে রিক্সায় উঠে বসলো। রিক্সাওয়ালাকে বললো—বাজারের ভিতর দিয়ে চল।

বাজারে এক সোনারূপার দোকানে অমিয় নামলো। 'বেস্ট প্লেয়ার' মেডেলখানি তখনও তার গলায় ঝুলছিলো, সে দোকানদারকে বললো—আমায় এই মেডেলখানা রেখে আমায় দুটো টাকা দিন, কালই দিয়ে যাবো।

দোকানদার খেলা দেখতে গিয়েছিলো, অমিয়কে সে চিনলো, মেডেল রেখে টাকা দিলো। অমিয় রিক্সা ছোটালো হাসপাতালে।

গরু মাথা নীচু করে গুঁতো মেরেছিলো, তাতে বিজনের ডান উরু আধ-ভাঙা-অবস্থা—গ্রীণ স্টিক ফ্যাকচার হয়েছে, শিংয়ের গুঁতো লেগে উরু কেটেছে। ডাক্তার বললেন—দু দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। প্ল্যাস্টার করার পর ছুটি।

বিজন কিন্তু আর এখন সে বিজন নেই, বললো আমি একা এখানে রাতে থাকতে পারবো না; অমিয়, তুই যাসনে।

বিজন অমিয়কে আর ছাড়তে চায় না।

ডাক্তার বললেন—বেশ তবে তুমিও থাকো, অসুবিধে কিছু নেই।

অমিয়কে সারা রাতই থাকতে হলো। বিজনের বাবা বাইরে চাকরি করেন, বাড়ীতে আর পুরুষ মানুষ নেই।

পরদিন সকালে প্রথম বাসে অমিয় ফিরলো, আগে এলো বিজনের মায়ের কাছে।

বিজনের সব কিছু সুব্যবস্থা করতে অমিয়র তিনটি দিন লাগলো। তিনদিনই ইস্কুল কামাই। চতুর্থ দিনে অমিয় ইস্কুলে এলো। এগারোটার সময় ক্লাস শুরু হতেই হেডমাস্টার মশাই এসে বললেন—অমিয়, এই নাও তোমার মেডেলটা, আমরা দোকান থেকে নিয়ে এসেছি। তুমি আমার ইস্কুলের বেস্ট প্লেয়ার শুধু নও, তুমি সত্যি আমার ইস্কুলের 'বেস্ট ম্যান্'।

হেডমাস্টার মেডেলটা আরেকবার অমিয়র গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

দু মাস পরে বিজন ইস্কুলে এলো। এলো অমিয়র হাত ধরে। বসলো অমিয়র পাশে। অমিয় এখন বিজনের 'বেস্ট ফ্রেণ্ড'।

সাগরের নীচে যা আছে

॥ শ্রীভূতনাথ ভট্টাপাধ্যায় ॥

ভূগোলে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো, পৃথিবীকে যদি চারভাগে ভাগ করা যায়, তবে তার তিনভাগই জল আর একভাগ মাত্র স্থল—তাই না? তাই এটা অনুমান করা নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে আমরা পৃথিবীর স্থলভাগে যে শক্তি, খাদ্য আর সম্পদ পাচ্ছি তার চাইতে আরো অনেক অনেক বেশী পেতে পারি জলভাগের কাছ থেকে।

তোমরা জানো আজ শুধু আমাদের এই ভারতেই নয় সারা পৃথিবী জুড়ে খাবার জিনিসের অভাব পড়েছে। আচ্ছা এই অভাব আগে ছিল না, কিন্তু এখনই বা হচ্ছে কেন বলো তো? দিন দিন লোক বাড়ছে বলে। তা হলে এই খাবার যোগাড় করা যায় কি করে তাই এখন চিন্তা করা দরকার এবং এমনিভাবেই চিন্তা করতে করতে বিজ্ঞানীরা এতো দিনে একটা সুরাহা করতে পেরেছেন। তাই তোমাদের এখন বলছি শোনো।

সাগরের তলদেশে শক্তি আছে, খাদ্য আছে আর আছে প্রচুর মণি-মাণিক্য, কয়লা, লৌহ ইত্যাদি খনিজ সম্পদ যার একভাগ মাত্র আমরা পৃথিবীর স্থলভাগে পাচ্ছি। শুনলে তোমরা অবাক হবে সাগরের তলায় প্রচুর গাছপালা জন্মায় আর তাতে প্রচুর ফলফুলও হয় এবং এই সকল গাছ-গাছালি বা তার ফলফুল মানুষের খাদ্য। এর স্বাদ অতি চমৎকার আর পুষ্টিকরও বটে। আর সাগরের মাছের কথা তো তোমরা জানোই—তা খেয়ে তো আজ পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক বেঁচে আছে এবং বেশ সুস্থ সবল ভাবেই বেঁচে আছে। বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে সাগরের তলায় জন্মানো গাছ-পালার দিকে বিশেষ করে নজর দিয়েছেন। এই গাছপালা আর ফলফুল যোগাড় করার জন্য তাঁরা তিনটি উপায়ও বার করেছেন বিশেষ বুদ্ধির বলে। প্রথমটি হচ্ছে ডুবুরী নামিয়ে তা সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়—ডুবো জাহাজ বা 'সাবমেরিন' নামিয়ে তা তুলে আনা আর তৃতীয়টি হচ্ছে 'স্কুবা গিয়ার' নামে ঘরের মতো একটা যন্ত্র নিয়ে সাগরের তলায় বরাবর নেমে যাওয়া আর ফসল সংগ্রহ করা।

তোমরা হয়তো জানো না এখন ডুবুরীরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র সাগরের তলায় থাকতে পারে, কিন্তু এর পরে এমন দিন আসছে যে ডুবুরীরা সাগরের নীচে অনেকদিন থাকতে পারবে। তাতে করে তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারো যে সাগরের সব্জী আর ফসল যোগাড় করে আনার কাজ আরো অনেক সহজ হয়ে যাবে—তাই না?

ভাবলে তোমরা অবাক হবে এইসব গাছপালা সাগরের তলায় আপনা-আপনি জন্মেছে এবং এতো প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে যে তা পৃথিবীর লোকে খেয়ে কোনো দিনও শেষ করতে পারবে না। আর খনিজ সম্পদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাতে করে পৃথিবী হাজার হাজার বছর কোনো ভাবনা-চিন্তা না করেই চলতে পারবে। আর সাগরের মাছের কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি; তা দিয়ে তো এখনই পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক খেয়ে পরে বেঁচে আছে। বিজ্ঞ

দ্বারা এগুলো সংগ্রহ করলে তো আর কোনো কথাই নেই। মানুষের খাওয়াপরার ভাবনা তা হলে চিরদিনের মতো চলে যাবে—তাই না?

তবেই বোঝো বিজ্ঞান আছে বলেই না আমরা আছি—বিজ্ঞানীরা আছেন বলেই না পৃথিবীটা এখনো ঠিক মতো চলছে। তা হলে খাবার জন্যে আর এমনিভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না রেশনের দোকানে দোকানে; সাগরের তলা থেকে টাটকা শাক-সব্জী আর ফল শস্য একদিন বিজ্ঞানের শক্তিতে তোমার হাতের কাছে এসে পৌঁছুবে; শুধু যা ডান হাতে করে তা মুখে তোলার অপেক্ষা—এই আর কি!

বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীরা তোমাদের আমাদের জন্য এতো ভাবছেন; এসো আমরা-তোমরাও তাঁদের জন্য একটুখানি ভাবি, কেমন? অন্ততঃ তাঁদের ভাবনার অংশীদার তো হতে পারি—তাতে করে আমাদের জ্ঞানের পরিধি তো বাড়বেই এবং সহজে তা হলে কেউ বোকা বানাতেও পারবে না।

মাতৃ-ভক্তি

॥ ফণিভূষণ বিশ্বাস ॥

সেদিন হঠাৎ স্বর্গলোকে গণেশ এবং কার্তিকে,—
তর্ক হলো দুর্গা মাকে ভক্তি করে সত্যি কে?
মুখে মুখে তর্ক যখন চরমেতে উঠলো,—
গোবেচারা গণেশ তখন কৈলাসেতে ছুটলো।
চাইলো সেটা মায়ের কাছে যাচাই করে জানতে।
মা শুনে তাই লোক পাঠালেন কার্তিকেরে আনতে।

ময়ূর থেকে নেমেই এসে বললে হেসে ঠিক,—
"সবাই জানে মায়ের সেরা ভক্ত ছেলে কার্তিক।"
মা বললেন, "মুখে অমন বড়াই করে লাভ কি,—
এখুনি চাই জানতে আমি আসল মনোভাবটি!
দেখি এবার সাক্ষ্য-প্রমাণ পারো কত জুড়তে,—
এখুনি তাই যেতেই হবে ত্রিভুবনে ঘুরতে।"

সফর সেরে সবার আগে 'ব কাছে যে জুটবে,—
নামটি যে তার সেরা ভক্তের তালিকাতে উঠবে।
এই শর্ত শুনেই গণেশ হলো ঈষৎ চিন্তিত,—
কার্তিকের আর ত্বর সহে না—রওনা দিতে উদ্যত।
পরক্ষণেই তীরবেগে তার ময়ূর জোরে উড়লো,—
গণেশ তখন তিন চক্কর চৌদিকে মার ঘুরলো।

তার পর সে প্রণাম করে বললে হেসে "জননি!—
তোমার পাশের ত্রিভুবনেই ঘুরে এলাম এখনি।"
মা শুনে ক'ন "ধন্য গণেশ! আয়রে, বাছা, বক্ষেতে,—
আনন্দে আর গর্বে আমার জল আসেরে চক্ষেতে!
মায়ের স্বরূপ এমন করে কেউ দেখেনি প্রাণভরে,—
তাই কার্তিক অন্ধ এমন নিজ শক্তির দম্ভে যে!"

এমন সময় ফিরে এসেই কার্তিক কয় সগর্বে,—
"দাও মা এবার বিজয়মালা, চরণধূলি এ পর্বে!
তোমার আদেশ মানতে গণেশ হয়তো সাহস পায়নি,—
তাই বোকাটা স্বর্গ ছেড়ে এক পা কোথাও যায়নি!
ভক্তি-রসের পায় নি সাড়া ও বেচারা অন্তরে,—
তাই জাগেনি চিত্ত উহার—উদ্দীপনার মন্তরে।"

মা বললেন, "ঐ জেনেছে ভক্তি-বাদের সত্যকে,—
সেই মন্ত্রেই জয় করেছে বিশ্ব-মাতার চিত্তকে।
মায়ের অঙ্গ-ধূলায় আছে ত্রি-ভুবনের চিহ্ন যে,
সেই মাকে ঠিক চিনতে পারে ভক্ত সে বই ভিন্ন কে?
সর্ব লোকের প্রতীক মায়ের যে দেখেছে অঙ্গেরে,
জয়ের আশায় পাল্লা দেবে সেই ভক্তের সঙ্গে কে?

———

॥ গৌরী চৌধুরী ॥

ডাঃ বিভারের ভুল

কাছাকাছি আসতেই সজারুটা বলল—গলার স্বরে রীতিমত উত্তেজনা—এই যে, ইনি হচ্ছেন আমাদের হেডমাস্টার মশাই, ডাঃ রমণীরঞ্জন বিভার। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ।

নমস্কার, নমস্কার—ডাঃ বিভার তাঁর প্রকাণ্ড থাবাটা কুপকুপের দিকে সাদরে এগিয়ে দিলেন। নরম বাদামী চোখ দুটোতে বেশ একটা ভালোমানুষ-ভালোমানুষ ভাব। নাঃ, তেমন ভয়ের কিছুই নেই। থাবাথাবি করল কুপকুপ, মিষ্টি করে বলল—নমস্কার।

কিন্তু···গুড়গুড়ের ঐ কথাটার মানে?

ইস্কুলে পটকাবুড়োর কাছে বিভারদের কথা কুপকুপ শুনেছিল বটে, কিন্তু চোখে দেখা এই প্রথম।

একদিকে মাথাটা কাৎ করে ডাঃ বিভার বললেন—গুড়গুড়েটা বকবক করে আপনাকে বিরক্ত করে নি তো? হাজার হোক ছেলেমানুষ তো—

কুপকুপ বললে—হ্যাঁ···মানে না, না···

ডাঃ বিভার ওসব শুনতেই পেলেন না, বলতে লাগলেন—কোন পথে আসছেন যদি একটু খবর পেতাম, তা হলে বড়-সড় কাউকে পাঠাতাম, আপনাকে এগিয়ে নিয়ে আসত।

গুরুগম্ভীর ভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন ডাঃ বিভার, চশমাটা নাকের ওপর সুরুৎ করে আরো এক ইঞ্চি নেমে এল—যাক ওসব ভেবে আর এখন লাভ নেই, আপনি তো এসেই পড়েছেন। একটা পথ আসতে হয়েছে আপনাকে, একটু শরবত-টরবত—?

ম্···তা···মন্দ কী? ঠিক কী বলবে কপকুপ ভেবে পেল না। সজারুটার দিকে তাকাল। সজারু হেডমাস্টারের দিকে অল্প একটুখানি মাথা হেলিয়ে ফিসফিসিয়ে কুপকুপকে বলল—উনি কানে কম শোনেন, আরো চেঁচিয়ে বলুন।

কথাগুলো হেডমাস্টারমশায়ের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। উনি কুপকুপের দিকে তাকিয়ে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে। আমরা একটু গলা ভিজিয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দি। সব তৈরী আছে, আপনি গেলেই দেখতে পাবেন, সব একেবারে ঠিকঠাক।

কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিল না কুপকুপ। সবুজ মাঠ ঝিকিমিকি নদী সব ফেলে রেখে ওদের সঙ্গে পথের ওপর নেমে আসতে হল ওকে।

খানিকটা চড়াই। ডাঃ বিভার চলেছেন আগে আগে, পেছন পেছন কুপকুপ। তার পেছনে গুড়গুড়ে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমাগতই পিছিয়ে পড়ছে বেচারা।

একটা জায়গায় লম্বা লম্বা রূপোলী ভুর্জগাছের জটলা। কুপকুপের মনে হল, এই বেলা পালাই। তক্ষুণি ডাঃ বিভার একটু বেশি এগিয়ে গেছেন মনে করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পালাবার যো কি!

ঝোপের ফাঁক দিয়ে আঙুল দেখালেন ডাঃ বিভার —দেখতে পাচ্ছেন?

কুপকুপ তাকাল। কী দেখবে? দেখার মধ্যে আছে খালি এক বিরাট প্রকাণ্ড বটগাছ। গাছটা এত বড় যে অন্য গাছগুলোকে ওর কাছে ডালপালার মতন লাগছে। গাছটার তলার দিকে একটা বড়-সড় গর্ত, আর সারা গুঁড়িময় চৌকো চৌকো সব ফোকর—বাড়ির গায় জানলার মতন।

বেশ চমৎকার পুরোন জায়গা—কী বলেন? ডাঃ বিভার বললেন—আসুন, ভেতরে আসুন।

দোনামনা করতে করতে কুপকুপ চলল হেডমাস্টারের পেছন পেছন। ওর মনে হচ্ছিল বটের ভেতর থেকে যেন একটা একটানা গুনগুন আওয়াজ ভেসে আসছে। কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আওয়াজ ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল, শেষকালে আলাদা আলাদা গলা পর্যন্ত শোনা যেতে লাগল। ডাঃ বিভার সগর্বে কুপকুপের দিকে তাকালেন—খুব পড়ছে সব, বুঝতেই পারছেন একেবারে যাকে বলে পড়া।

কুপকুপের অস্বস্তি ক্রমশই বেড়ে উঠছিল। ডাঃ বিভার ওর জন্ত অপেক্ষা করছিলেন কেন? এরা কী চায়? সবাই ওকে আপনি-আজ্ঞে করে কেন?

কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব কোথায়?

বাড়ির মতই দূর!

দরজার একেবারে সামনাসামনি আসতে কুপকুপের নজরে পড়ল একটি বস্তু—এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি। গাছের গুঁড়ির ওপর লটকানো রয়েছে একটা চৌকো কাঠের তক্তা, এক দিকটা একটু হেলে পড়েছে আবার, ওপরে লেখা—

ডাঃ বিভারের প্রাথমিক বিদ্যালয়

বেতন বেশি নয়

ভিতরে আবেদন করুন

ভেতরের আওয়াজটা চীৎকারে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণে, এমন কি বাইরে পাখিদের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। এসব ডাঃ বিভারের কান-সওয়া বলে মনে হল, উনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ভদ্রলোক কানে কম শোনেন কিনা, তাই—ভাবল কুপকুপ।

সজারুটা কদ্দূর যে পিছিয়ে পড়েছিল তার ঠিক নেই, আর দেখাই যাচ্ছিল না ওকে। ঝলমলে রোদ ছেড়ে অন্ধকার বটের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে কুপকুপের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল, আবার মনে হল—পালাই। সেই মুহূর্তে কাঁধের ওপর থাবা রাখলেন ডাঃ বিভার—সিঁড়িগুলো দেখবেন।

অগত্যা—

তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে বটপাতা দিয়ে সেলাই করা একটা পর্দা পেরিয়ে ওরা এসে পৌঁছল একটা ছোট্ট ঘরে। ঘরখানায় বেশ আলো, মেঝের ওপর ঝাউপাতা বিছোন, আর ঘরময় বেশ একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল কুপকুপের।

কোণের দিকে একটা দেয়াল-আলমারি। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ডাঃ বিভার বললেন—বুড়ো হয়েছি ঠিকই। কিন্তু আরাম করতে জানি না একথা কেউ বলতে পারবে না। বলুন, কী খাবেন?

চশমার ভেতর দিয়ে পিটপিট করে কুপকুপের দিকে তাকালেন ডাঃ বিভার—

বাদামের শরবত বেশ ভালই হবে। নাকি মধুকুপকুপির দুধ? একেবারে টাটকা রয়েছে।

ম্···ম্···মধুকুপকুপির দুধই—একটা দারুণ আতঙ্কে হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে এল কুপকুপের। হেডমাস্টার কি ওকে নতুন ছাত্তর বলে ভুল করছে নাকি? এখন যদি ওকে কোন ক্লাসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় আর বলে, 'অঙ্ক কষ'—তা হলে? কী হবে এখন?

ডাঃ বিভারের এগিয়ে-দেওয়া দুধের গেলাসটা কুপকুপের হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল আর একটু হলে—

বসুন আজ্ঞে—একটা চেয়ার আঙুল দিয়ে দেখালেন ডাঃ বেভার। কুপকুপ বসল। একটু একটু করে মধুকুপকুপির দুধে চুমুক দিতে লাগল, ? তাজা ঢলঢলে সোনারঙ দুধ। খেতে খেতে ঘরের চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কুপকুপ। দেয়ালে কতগুলো ছবি ঝুলছে, টেবিলটা ঝকঝক তকতক করছে চেয়ারগুলো পুরু গদি আঁটা, দেখতেও আরাম। নাঃ, হেডমাস্টারমশাই আরাম করতে জানেন সত্যিই।

এ ধরনের কাজ আপনাকে প্রায়ই করতে হয় নিশ্চয়? হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ডাঃ বিভার।

সব্বোনাশ! আড়চোখে তাকাল কুপকুপ।

ডাঃ বিভার উত্তর-টুত্তরের ধার ধারলেন না, বলে চললেন—শিক্ষা-দপ্তরকে যখন একজন এগজামিনার পাঠাতে লিখেছিলাম, ভরসা ছিল না ওঁরা পাঠাবেন। 'না' বলবেন, এইটাই ধরে নিয়েছিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্কুল খুব বড় নয়—হেডমাস্টারের গলায় কিন্তু-কিন্তু ভাব—আর ছাত্ররা সব একেবারে ছেলেমানুষ।

কুপকুপের কান দপদপ করতে লাগল—এগজামিনার! শিক্ষা-দপ্তর।

ওঁরা যখন আমাকে লিখলেন, একজন নামকরা প্রফেসরকে পাঠাচ্ছেন, তখন বুঝতেই পারছেন কতটা আনন্দ হল। এই যে, ওঁদের চিঠি—খুব সাবধানে পাশের শেলফ থেকে একটা বই নামালেন ডাঃ বিভার, তার ভেতর থেকে বার করলেন একটা কাগজ। সগর্বে বললেন—এটা বাঁধিয়ে রাখতে হবে।

কুপকুপ চিঠিটা নিয়ে পড়ল—

ওপরে লেখা,

শিক্ষাদপ্তর, কাঠবিড়ালীবন। তারপর—

ডাঃ বিভার

মাননীয়েষু,

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। সানন্দে জানাইতেছি, আগামী বৃহস্পতিবার প্রফেসর কক্কড় আপনার ছাত্রদের পরীক্ষা করিতে যাইবেন। সেরা ছাত্রদের পুরস্কারও দিবেন। দ্বিপ্রহর-নাগাদ প্রফেসর কক্কড় আপনার বিদ্যালয়ে পৌঁছিবেন।

উনি যে একজন কাঠবিড়ালী, আশা করি একথা বলিয়া দিতে হইবে না। উনি অসাধারণ বুদ্ধিমান।

নমস্কারান্তে—ইতি

অনুগত........

তলায় সই। কার সই কী বৃত্তান্ত—অত মাথা ঘামাতে কুপকুপের বয়ে গেছে। ও. ব্যাপারটা এই! সবাই ওকে এগজামিনার ঠাউরেছে! তাই এত আপনি-আজ্ঞের ঘটা!

চিঠিটা সুন্দর না ?—কুপকুপের ভাবনায় বাধা দিলেন ডাঃ বিভার।

তা…হ্যাঁ…হ্যাঁ—তাড়াতাড়ি বলল কুপকুপ—

– ওঁরা আপনার খুব প্রশংসা করেছেন।

—তা…তা বটে।

—কিন্তু…আপনাকে দেখে তো মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষ।

—তা…হ্যাঁ—

নিজেকে মনে মনে ধমকাল কুপকুপ—এইভাবে যদি আমতা-আমতা করতে থাক, তা হলে তো ধরা পড়ে যাবে বাছাধন, ঝেড়েপুড়ে উঠে বস।

শুধু এইটুকু আমার বলার আছে যে ডাঃ বিভারের কথা ফুরোয় নি তখনো—আমার ছাত্রদের বয়েসটা একটু মনে রাখবেন। খুব বেশি শক্ত প্রশ্ন—

না, না, তা কখনো করি ?—তাড়াতাড়ি বলে উঠল কুপকুপ। কি ভাগ্যি, ডাঃ বিভারের ইস্কুলটা বাচ্চাদের ইস্কুল। এই যদি বড়দের ইস্কুল হত!

থেমে গেল কুপকুপ। কী ভাবছে সে ? নিজেকে শাসিয়ে বলল মনে মনে—তুমি হচ্ছ একটি ইস্কুল-পালানো ছেলে। প্রফেসর নও।

কিন্তু…কিন্তু…বেশ মজা হবে মনে হচ্ছে।

ডাঃ বিভার দাঁড়িয়ে উঠলেন—আপনি তৈরী ? তা হলে চলুন আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করি।

চট করে ভেবে নিল কুপকুপ।

—হ্যাঁ, চলুন। আপনি আগে—

ক্লাস ওয়ান

এতক্ষণে স্কুলের ভেতরের অন্ধকারটা কুপকুপের চোখে সয়ে এসেছিল। চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কুপকুপ। কৌতূহল ক্রমেই বাড়ছিল ওর। প্রথমে ওরা গেল 'নিচের হলে'—হেডমাস্টারমশায় তাই তো বললেন নামটা। দরজা দিয়ে একমুহূর্তের জন্য বাইরের দিকে তাকাল কুপকুপ—রোদে ঝলমল করছে। তারপরই ওকে মন দিতে হল অন্যদিকে।

হলের ও-ই কোণে আঙুল দেখিয়ে ডাঃ বিভার বললেন—ঐটে হল আমাদের স্টেজ। প্রত্যেক বছর একবার করে নাটক করি আমরা। অর্কেস্ট্রাও আমাদের নিজেদেরই।

বা রে! কুপকুপ বলল—কী কী বাজনা বাজান আপনারা ?

—এই ধরুন বাঁশী রয়েছে, তবলা রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে গিয়ে আপনার চটর-পটর-ঝুম।

—চটর-পটর-ঝুম ?

—হ্যাঁ, ঐ একধরনের তবলাই বলতে পা। তবে আওয়াজটা আরো বেশি হয় আর কি।

—আচ্ছা।···সায় দিল কুপকুপ। আসলে কিচ্ছুটি বোঝে নি ও।

হলের একপাশ দিয়ে লম্বা সিঁড়ি উঠে গেছে। তার তলায় একটু থেমে ডাঃ বিভার বললেন—

এইখানটা একটু সাবধান, বুঝলেন, আমার ছাত্ররা আবার একটু রগুড়ে আছে। মাঝে মাঝে ওরা সিঁড়ির ধাপগুলো চিবোয়, ফলে ওগুলো এমন কমজোরি হয়ে যায় যে উঠতে গেলে ভেঙে পড়ে। সবই অবশ্য মজা ক'রে করে ওরা, ইচ্ছে ক'রে কি আর—

—তা তো বটেই···কুপকুপ বলল মিহি করে, যদিও মজাটা বেশ বেয়াড়া ধরনের বলেই মনে হচ্ছিল ওর।

ডাঃ বিভার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন—সিঁড়িগুলো মেরামত করতে আমার যা খরচ হয় তাতে—

মড়্ মড়্ মড়াৎ—

হেডমাস্টারমশায়ের বাক্যাবসানের অপেক্ষা না রেখেই একটি পাটাতন ওঁর পায়ের তলা থেকে সুরুৎ করে সরে গিয়ে হলের মেঝেয় পড়ল। কোনরকমে রেলিংটা ধরে ফেলে হেডমাস্টারমশাই চিৎপটাং হতে হতে বেঁচে গেলেন। টেনে-হিঁচড়ে ওপরের ধাপটায় উঠে কুপকুপের দিকে তাকালেন উনি—

দেখলেন?

ওঁর চশমাটা সরে গিয়ে ডান কান থেকে ঝুলছিল।

কুপকুপ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, যদিও ওঁর ব্যাজার মজার মুখখানা দেখে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল ওর। কিন্তু ও যে এগজামিনার একথা মনে হতেই হাসিটা সামলে নিলে কুপকুপ।

হেডমাস্টারমশায়দের ভালো-মন্দ কিছু হলে এগজামিনারদের কখনো হাসতে আছে? ছিঃ!

হাঁ-করা জায়গাটা টপকে হেডমাস্টারকে বেশ খানিকটা সামনে রেখে কুপকুপ উঠতে লাগল —বলা যায় না, আবার যদি আর একটা ধাপ ধপাস্ হয়!

শেষপর্যন্ত ওপরে এসে পৌঁছল ওরা। একটা চৌকোমত দালান, এধারে ওধারে সেধারে দরজা, সরু সরু অলিগলি। প্রত্যেকটা দরজার মাথায় ছোট ছোট নোটিশ ঝুলছে। একটায় লেখা—

লাইব্রেরী
কিছু পুস্তক হাতে আসিলে
খোলা হইবে

আর একটায়—

শাস্তি-ঘর
পার যদি ঢুকো না

তিন নম্বর দরজার সামনে থেমে গিয়ে ডাঃ বিভার বললেন—ইঁদুরদের ক্লাসেই প্রথম যাওয়া যাক—কী বলেন? একেবারে কচি—মনে আছে তো?

—হাঁ, হাঁ, মনে আছে বই কি···কুপকুপ বলল। রীতিমত ভাবনা হচ্ছিল ওর। কী ধরণের প্রশ্ন করা দস্তুর?

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন ডাঃ বিভার, পেছনে পেছনে কুপকুপ। ঘরখানায় দিব্যি আলো। লম্বা লম্বা তিন সারি ডেস্ক। সেগুলোর পেছনে বসে আছে সারি সারি ইঁদুর। এত ইঁদুরও পৃথিবীতে ছিল!

ওরি মধ্যে একটা বেশ বড়-সড় ভারিক্কি-ভুরিক্কি ডেস্কের কাছে কুপকুপকে নিয়ে এলেন ডাঃ বিভার—

ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ধেড়ে ইঁদুর। ধেড়েবাবু, ইনিই আমাদের এগজামিনার।

ধেড়েবাবুর সঙ্গে থাবাথাবি করল কুপকুপ। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যারকেরে গলায় ধেড়ে বললেন—মন দিয়ে পড়া কর সব। একটু যদি এদিক-ওদিক দেখেছি তো সব একধার থেকে ধরে ধরে বেতন।

কুপকুপের দিকে ফিরলেন ধেড়েবাবু—আমার হচ্ছে ওই। বুঝলেন? কড়া শাসন চাই, একেবারে কড়কড়ে। ব্যস্ আর কোন ঝামেলা হবে না। মনে আছে ছোটবেলায়—

তা—তা তো বটেই, ঠিকই তো—বললেন ডাঃ বিভার—কিন্তু প্রফেসর কক্কড় যে আপনার ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে এসেছেন।

[illegible] দমলেন না ধেড়েবাবু, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তো ওদের আগেই খবর পেতাম,য়েছি। করিনি একথা বলুক দিকি কেউ!

[illegible]তে বলতে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন ধেড়েবাবু, আঙুল নেড়ে [illegible]লেন—

এাই, হাসছিস যে বড়! অ্যাঁ? এটা কি নাট্যশালা?

যাকে কথাগুলো বলা হল সে হচ্ছে ও ছোট্ট মেঠো ইঁদুর, নাম তার ধান-খুঁটি-খুব। তাড়াতাড়ি বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, মুখখানা দেখা গেল না।

কড়া শাসন চাই—ধেড়েবাবু বললেন হেঁড়ে গলায়—মনে আছে, ছোটবেলায় বাবা আমাকে প্রত্যেক দিন লাঠিপেটা করতেন। প্রত্যেক দিন।

এমন করে বললেন যেন ওঁর খুব ভালো লাগত সেটা।

বলতে বলতে আবার হঠাৎ ডেস্কের ভেতর দিয়ে শাঁ করে একটা পোড়োর দিকে তেড়ে গেলেন ধেড়েবাবু। ডাঃ বিভার কুপকুপকে একটু পাশে টেনে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন—এটা ওঁর ধরণ। আসলে খুব ভালো মাস্টার। একটু চেঁচামেচি ভালবাসেন আর কি। মনটা গঙ্গাজল।

—উনি কি খুব শাস্তি দেন?···কুপকুপ শুধোল। এই ক্লাসে যারা পড়ে সে বেচারাদের অবস্থাটা ভাবছিল ও।

—উঁহু, আপনার লেজের দিব্বি। উনি কেবল তর্জান আর গর্জান। বর্ষাণ না বড় একটা।

—বাঁচা গেল।···মাথা নাড়ল কুপকুপ।

ধেড়েবাবু ওদিকে সমানে চ্যাঁচ্যাঁচ্যাঁচ্যাঁচ্যাঁচ্যাঁচ্যাঁচাচ্ছিলেন, কিন্তু পোড়োরা একটুও ভয় খাচ্ছিল না তাতে। কুপকুপ তো স্পষ্টই দেখল, দুনম্বর সারিতে বসে দুজনে চোখটেপাটেপি করল।

—তিনটে সারি কেন?···ডাঃ বিভারকে শুধোল কুপকুপ।

—হ্যাঁ, এ প্রশ্ন তো আপনি করতেই পারেন—মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন ডাঃ বিভার—

এক নম্বর সারিতে আছে মেঠো ইঁদুর।

দু নম্বরে গেছো ইঁদুর।

আর তিন নম্বরে শুধু নেংটি। ওদের মাইনেটা একটু বেশি পড়ে—

মুচকি হাসলেন ডাঃ বিভার। আর কিছু বলার আগেই ধেড়েবাবু লম্ফ দিয়ে ফিরে এলেন।

ওরা সব তৈরী, এখন আপনি শুরু করতে পারেন স্যার—হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ধেড়েবাবু।

কুপকুপ একটু কেশে নিল, গলাটা জবড়জঙ্ হয়ে আছে।

হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—···ওরা এখন কী পড়ছে? প্রাণপণে প্রশ্নের কথা ভাবতে ভাবতে জিগ্যেস করল কুপকুপ।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ধেড়েবাবু—ভাষা। ওপরকার তলাকার, দুই-ই।

ওপরকার এবং তলাকার ভাষা বলতে কী বোঝায় ঠিক না বুঝলেও মাথায় একটা বুদ্ধি কুপকুপের। এক পা এগিয়ে গিয়ে লেজটা মেঝের ওপর থবথবিয়ে কুপকুপ চেঁচিয়ে বলল

ধেড়েবাবু চ্যাঁচালেন—এ্যাই, সব এদিকে মন দাও। মুখখানা একেবারে গরুর ধেড়েবাবুর।

আমি তোমাদের তিনটে প্রশ্ন করব—কুপকুপ বলল—দেখি কজন বলতে পার।

হ্যাঁ, আর যে তিনটেই পারবে, সে প্র পাবে। তাই না প্রফেসর কক্কর? ডাঃ বিভার বললেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই, তাই—শিক্ষাদপ্তরের চিঠিটা মনে করতে করতে কুপকুপ সায় দিল—পরে দেওয়া হবে প্রাইজটা।

কে গোলমাল করে র‍্যা? চেঁচিয়ে উঠলেন খেড়েবাবু। কেউই গোলমাল করছিল না, সব ভিজে ইঁদুরটি হয়ে বসেছিল, সুতরাং—

কুপকুপ আরম্ভ করল—আমার একনম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, ওপরকার এবং তলাকার ভাষা—মানে কী?

একসঙ্গে সব ইঁদুর, নেংটিরা পর্যন্ত, হাত তুলল।

বড্ড সোজা—খেড়েবাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন।

বিবেচনা আছে—ডাঃ বিভার মাথা নাড়লেন।

কুপকুপ খুব খুশী। সামনের সারির একটা ইঁদুরকে আঙুল দেখাল—এই, তুমি বল।

বলব স্যার? মাটির ওপর যেসব ভাষা বলা হয়, আর মাটির তলায়—

সব কটা হাত একসঙ্গে নেমে এল।

একেবারে জলের মত—খেড়েবাবু খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন।

কুপকুপ বুঝল, উত্তরটা ঠিক হয়েছে।

—এবারের প্রশ্নটা একটু শক্ত। এও অবশ্য ঐ ভাষার ওপরেই। মনে কর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে একটা বাবুইয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হল, সে তোমায় বলল—বাকলু চাকুম ঘট্ ভট্। তার মানে কী?

সব চুপ।

একটু পরে ডাঃ বিভারের বিড়বিড় শোনা গেল—

বাকলু চাকুম ঘট্ ভট্!

খেড়েবাবু ভ্যাবাগঙ্গারাম—

বাকলু চাকুম ঘট্ ভট্!

'হ্যাঁ', দৃঢ়গলায় বলল কুপকুপ, 'মানে কী'?

বাকলু চাকুম ঘট্ ভট্

র ভ্যাবাচাকা মুখগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল কুপকুপ। একজন দুজন কাচ্ছিল, আর সবাই কীরে?—চোখে এর ওর দিকে তাকাচ্ছিল। পেছনের সারিতে দের মধ্যে কিসব ফিসফিস আলোচনাও করছিল ক'জন। খেড়েবাবুর নজর গেল সঙ্গে সঙ্গে—ই চুপ। চুপ করলি?

তারপর ধেড়েবাবুও হতভম্ব মুখে হেডমাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকালেন—বাকলু-চাকুম ঘট্ ভট্! বাকলু চাকুম ঘট্ ভট্!

মনে মনে হাসল কুপকুপ। এ প্রশ্নের উত্তর কেউ বলতে পারলেই আশ্চর্যের কথা। কথাগুলো ওর নিজের বানানো। এ-ই ভালো সবচেয়ে। কেউ বলতেও পারবে না, ওকে প্রাইজও দিতে হবে না।

কুপকুপ যখন মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করছে, সামনের সারি থেকে একটি ছোট্ট মেঠো ইঁদুর উঠে দাঁড়াল—সেই ধান-খুঁটি-খুব।

—বলব স্যার?

—বল।

—কথাটা কী? চাকলু বাকুম ঘট্ ভট্, না বাকলু চাকুম ভট্ ঘট্!

কথাটা···কথাটা···থেমে গেল কুপকুপ। সব্বোনাশ! মনে পড়ছে না তো! আবার চেষ্টা করল কুপকুপ—

আমি বলেছি বাকলু চাকুম, থুড়ি, চাকলু—

আবার থামল কুপকুপ।

বাকলু চাকুম ভঁট্ ঘট্—বললেন ডাঃ বিশ্বার।

না তো, চাকলু বাকুম ঘট্ ভট্—ধেড়েবাবু বললেন।

দুই মাস্টার চোখ কটমটিয়ে তারপর কুপকুপের দিকে তাকালেন—কথাটা কী, প্রফেসর কক্কড়?

শুকনো ঠোঁটে জিভ বোলাল কুপকুপ। কী বলেছিল সে? হায় ভগবান্! একটা সাদামাটা প্রশ্ন করলেই ত হত! যতই ভাবতে লাগল, ততই গুলিয়ে যেতে লাগল কুপকুপের। বাকলু চাকুম ঘট্···না তো, চাকলু বাকুম ভট্···উঁহু, বাকলু চাকুম ভট্···

স্যার—বলল ধান-খুঁটি-খুব।

বল—কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল কুপকুপ।

হেডমাস্টার মশাইতে ধেড়েবাবুতে তখনো সমানে তর্ক করে যাচ্ছেন।

—এর মানে···এর মানে···ক'টা বাজে।

—কটা বাজে?

—হ্যাঁ স্যার যদি কথাটা হয় বাকলু চাকুম ঘট্ ভট্। কিন্তু যদি—

ঠিক ঠিক···ঠিক বলেছ—মাস্টারেরা কেউ কিছু বলার আগেই তাড়াতাড়ি বলে ৬ দশের ভেতর দশ। এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে—এইটেই শেষ···খুব সোজা—বল তো, এ ভাষার নাম, যা ওপরকারও নয়, তলাকারও নয়?

আবার সমস্ত ক্লাস চুপচাপ। সেই ...খা-চুলকোন, সেই পেছনের বেঞ্চে আস্তে আস্তে ফিসফাস। ধেড়েবাবুর বিড়বিড়ও শুনতে পেল ... কুপ—ওপরকারও নয়, তলাকারও নয়…

ডাঃ বিভার ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন—আপনি নিশ্চয় জানেন ?

জানি বই কি, আলবৎ জানি—ধেড়েবাবু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—এই মাত্তর পিছলে গেল মাথা থেকে। দাঁড়ান, ভাবতে দিন।

ক্লাসের দিকে ফিরে কুপকুপ বলল—কী হল ? কেউ না কেউ নিশ্চয় বলতে পারবে উত্তরটা ?

মনে মনে আর একবার নিজের বুদ্ধিকে বাহবা দিল কুপকুপ। এটা যদি কেউ না বলতে পারে, তা হলে ও অনায়াসে বলতে পারবে, প্রাইজ পাবার মত কেউ নেই ক্লাসে।

সব্বোনাশ! সামনের সারিতে উসখুস!

স্যার, বলি ?—উঠে দাঁড়িয়েছে সেই ধান-খুঁটি-খুব।

চোখটা কুঁচকে কুপকুপ বলল—আবার তুমি ?

—হ্যাঁ, স্যার, বলব ?

—শুনি ?

—স্যার, ওরকম কোন ভাষা নেই।

একদম বাজে উত্তর—ধেড়েবাবুর স্বগতোক্তি।

তাড়াতাড়ি ভেবে নিল কুপকুপ। যদি বলে উত্তরটা ভুল, তা হলে তো নিজেকে আবার ঠিক উত্তর ভেবে বার করতে হবে। এটাও তো ওর একটা চালাকি বই নয়! আবার যদি বলে ঠিক, তা হলে প্রাইজ দিতে হয়! ওর কাছে তো প্রাইজ নেই ছাই।

হ্যাঁ, ঠিক। ঠিক বলেছ তুমি—আস্তে আস্তে বলল কুপকুপ—তোমরা কে কতটা চটপটে পরীক্ষা করছিলুম।

বাঃ! ডাঃ বিভার থাবা ঘষতে ঘষতে উচ্ছ্বসিত হলেন—

ঠিক যা ভেবেছি তাই। আপনি কিন্তু ঠকে গেলেন ধেড়েবাবু।

ধেড়েবাবু একটু লজ্জিত হলেন—তা বটে। পরক্ষণেই আবার চোখমুখ ঝলমল করে উঠল ...ই হোক, আমার অন্তত একটা ছাত্রও তো প্রাইজ পেল।

...া পেয়েছে—হেডমাস্টারমশায় কুপকুপের দিকে তাকালেন—তা প্রাইজটা কী ধরণের ...সর কক্কড় ?

এই ধরুন বই হতে পারে—কুপকুপ আস্তে করে বলল। শ'খানেক মাইল দূরে কোথাও

চলে যেতে ইচ্ছে করছিল ওর। মনে মনে ভাবল রাখতে পারার কোন আশাই যখন নেই, তখন যা খুশি তাই তো বলে দেওয়া যায়।

বেশ ছবিওলা বই—বলল কুপকুপ।

কখন দেবেন প্রাইজটা ?—ডাঃ বিভার শুধোলেন।

এই, পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই—কুপকুপ বেশ স্থির গলায় জবাব দিল। সেই মুহূর্তে ও মনে মনে ঠিক করে ফেলল, পরীক্ষাটি শেষ হওয়া মাত্তর ভোঁ ভাঁ দৌড় দেবে।

চমৎকার হবে—ডাঃ বিভার বললেন—স্পোর্টসের পর প্রাইজগুলো বিলি করার ব্যবস্থা করা যাবে।

নিচের হলে—কুপকুপ যোগ করল। বলেই একটু লজ্জিত হল ও। সামনের সারির বাচ্চা ইঁদুরটা খুব লাফাচ্ছে। যখন দেখবে প্রাইজ-ট্রাইজ কিচ্ছু নেই, বেচারা কি মুষড়েই না পড়বে। কিন্তু কুপকুপ কী করতে পারে ?

এবার পরের ক্লাসটায় যাওয়া যাক, কী বলেন ? কুপকুপের কাঁধে হাত রাখলেন ডাঃ বিভার।

হ্যাঁ চলুন—কুপকুপ বলল—কিন্তু যাওয়ার আগে ধেড়েবাবুকে বাহবা দিতে হবে। ওঁর ক্লাস দেখে ভারী খুশী হয়েছি।

ঠকে গিয়ে ধেড়েবাবু তখনও রেগে ছিলেন, এ কথায় খুশী হয়ে উঠলেন।

কড়া শাসন চাই, বুঝলেন, কড়া শাসন। নইলে অসম্ভব। ওরা বুঝুক আমি কাজের মানুষ, কাজ চাই।—হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন ধেড়েবাবু, চেঁচিয়ে উঠলেন—এ্যাই! হাসছিস যে বড়! ক্লাসের মধ্যে আবার লবঞ্চুস খাচ্ছিস ? ফেল বলছি! ফেললি ?

ডাঃ বিভার কুপকুপকে নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন, পেছন থেকে ধেড়েবাবু বলতে লাগলেন—কড়া শাসন, বুঝলেন স্যার, কড়া শাসন চাই। বড় কাজ দেয়।

দরজা বন্ধ হতে হতে কুপকুপ শুনল ধেড়েবাবু একজনকে ফিসফিসিনি থামাতে বলছেন।

মনে মনে হাসল কুপকুপ। শেষে-উঠল-দুয়ো-র চেয়ে ঢের ঢের মজার খেলা, ও খেলেছেও ভালো।

একটা লম্বা গলির মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল দুজনে। দুপাশে দরজা। কুপকুপ লক্ষ্য করল নিজের মনে কী যেন ভাবছেন আর বিড়বিড় করছেন হেডমাস্টারমশাই।

হঠাৎ থেমে গেলেন ডাঃ বিভার, চশমার কাঁক দিয়ে বাদামী চোখ দুটো বার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি আসলে কী বলেছিলেন তখন ? চাকলু-বাকুম ঘট্ট ও চাকুম ভট্ট ঘট্ট ?

এই প্রথম কুপকুপের মনে পড়ল ঝী বলেছিল তখন—বাকলু চাকুম ঘট্ট ভট্ট।

হেডমাস্টার বললেন– বা‚কৃস্ম চাকুম   ভেট···ক'টা বাজে···বার বার আওড়াতে লাগলেন কথাগুলো, পাছে একবার থামলেই ভুলে যান।

অনেকগুলো বাঁক পেরিয়ে হেডমাস্টারমশাই আবার থামলেন একটা সবুজ দরজার সামনে। দরজার ওপাশ থেকে যে আওয়াজখানা আসছিল, কুপকুপের মনে হল যেন ভূমিকম্প আর কাল-বোশেখীর ঝড় একসঙ্গে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আওয়াজ ছাপিয়ে কয়েকটা গলাও শোনা যাচ্ছিল। দরজার ওপর নোটিশ—

হাতের কাজের ঘর

এক্কেবারে চুপ

ওরা তো বাপু মোটেই এক্কেবারে চুপ করে নেই—কুপকুপ মন্তব্য না করে পারল না। ডাঃ বিভারকে দেখে কিন্তু মনে হয় না কোথাও কোন গোলমাল আছে। বোধহয় কালা ব'লে—কুপকুপ ভাবল। কিন্তু গোলমাল যা হচ্ছে, তাতে চারপাশে পাঁচমাইলের চৌহদ্দির মধ্যে সব্বাইকার চমকাবার কথা। এমন হট্টগোল যে ডাঃ বিভার যে ওর সঙ্গে কথা বলছেন, প্রথমটা বুঝতেই পারে নি কুপকুপ।

এটা একটা বিশেষ ক্লাস, বুঝলেন? বয়স্ক ছাত্ররা যাতে বেশ যাকে বলে কাজের হয়ে উঠতে পারে, তার ব্যবস্থা।

হ্যাঁ, কাজের—আবার বললেন হেডমাস্টার। কী যেন ভাবছেন একটা।

কুপকুপ কিছু বলার আগেই পেছনে তড়বড় পায়ের শব্দ। দুজনে একসঙ্গে ফিরে দেখলেন—খেড়েবাবু!

খেড়েবাবুকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

—স্যার—হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন খেড়েবাবু।

—কী হয়েছে কী, বলেই ফেলুন না মশাই—ডাঃ বিভার বললেন।

—স্যার, আবার সেই লোকটা!

—অ্যাঁ? বলেন কী! আঁতকে উঠলেন ডাঃ বিভার—হতেই পারে না।

—হতে পারে না কী? হয়েছে। লোকটা বলছে যে—

ভারী ভারী পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল গলি দিয়ে। একটা রাগী গলা শোনা গেল—কোথায় সে? তাকে আমি দেখতে চাই। কোথায় সে বদমাশটা?

[চলবে]

একজন চালাকের গল্প

॥ ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী ॥

আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা। সেই ১৯৩১ সালের ঘটনা। আমরা সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছি। তখন ত পরীক্ষা দেবার কেন্দ্র অনেক অনেক ছিল না। তাই জেলা শহরে যেতে হয়েছিল পরীক্ষা দিতে। তখনকার দিন অন্য রকম ছিল—শহরে যারা থাকতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মফঃস্বল থেকে আসা ছাত্রদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন পরীক্ষার কয়েকটা দিন। এটা অনেকেই তাঁদের কর্তব্য কাজ বলেই মনে করতেন।

আমরা জন পনের ছাত্র আশ্রয় পেলাম এক জমিদার-বাড়ীতে। পরীক্ষার কয়েকটা দিন ভালই কাটল—পরীক্ষাও মোটামুটি ভালই দিলাম। পরীক্ষা শেষ হল—আমরা শহরটা ঘুরে দেখবার জন্য বেরোলাম। সন্ধ্যার সময় জুবিলী ট্যাঙ্কের ধারে একটা ব্যায়ামাগারে নানা রকম জিমন্যাস্টিক দেখান হচ্ছিল—তাই দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা রাত হয়ে গেল। জমিদার-বাড়ীর ফটকের সামনে যখন পৌঁছালাম দেখি ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। বললাম—দারোয়ানজী গেট খুলে দাও।

মস্ত গালপাট্টাওয়ালা দারোয়ান বুক চিতিয়ে বন্দুকটাকে ঘাড়ে নিয়ে বলল—ফটক খোলা হবে না।

আমরা ত হতভম্ব—বলে কি! আমাদের সব জিনিসপত্র ত বাড়ীর ভিতরে। ফটক না খুললে সে সব আনব কি করে! পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—শহরের হালচালই জানি না, তাতে আবার শহুরে জমিদার-বাড়ী।

জানবার দরকারই বা কি। কিন্তু করি কি এখন। রাতের খাওয়া না হয় নাই হল—কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র কি ওখানেই থাকবে নাকি।

দারোয়ানকে অনেক অনুনয় বিনয় করলে উত্তরে সে বলল—হুকুম নেহি হ্যায়।

সে কি কথা! কার হুকুম নেহি হ্যায়।

রাজাবাবুর!—দারোয়ান গোঁপ উঁচু করে বলল।

ওরে বাবা। আমরা কাঁদ কাঁদ হয়ে গেলাম। এখন উপায়? আমাদে
বয়সে বড় ছিল নগেনদা। সে এইবার নিয়ে আটবার আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষ
প্রত্যেকবার অঙ্কে ফেল করত সে আর সব বিষয়ে পাস করত। তখন এক বিষয়ে ফেল
ফেল বলে গণ্য করা হত। তাই অন্যান্য বিষয়ে ভাল জ্ঞান থাকলেও নগেনদার আর ম্যাট্রিক

করা হচ্ছিল না। নগেনদা আমাদের থামিয়ে —দাঁড়া সব বোকার দল। দেখি কি করা যায়। নগেনদার বয়স তখন প্রায় পঁচিশ। কাজেই তার কথায় ভরসা পেলাম।

সে গেটের ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। তারপর বলল—দেখত ঐটে রাজাবাবুর ছেলে না।

হাঁ সেই ত। কলেজে পড়ে খাঁটি জমিদার কায়দা দোরস্ত দামী পোশাক জুতো। আমাদের কাছে দু-একবার এসেছিল মাত্র। দু-একটা মামুলী কথা বলে গেছে। ঐ সূত্র ধরেই নগেনদা ওকে ডাকাডাকি করতে লাগল। ও ধীর পায়ে গেটের কাছে এগিয়ে এল পায়ে দামী হরিণের চামড়ার চটিজুতো ধেঁসড়ে ধেঁসড়ে হেঁটে। আমাদের সব কথা শুনল—বলল হাঁ বাবার হুকুমে গেট বন্ধ হয়ে গেছে—বাইরের কেউ ঢুকতেও পারবে না—আবার ভিতরের কেউ যেতে পারবে না। আচ্ছা তোমাদের জন্য কি করা যায় আমি দেখছি, তোমরা দাঁড়াও। সে চলে গেল। আধঘন্টা বাদে ফিরে এসে বলল—তোমরা এই বাইরের উঠানে দাঁড়াও—আমাদের লোকজন তোমাদের সব জিনিসপত্র সার্চ করে তোমাদের কাছে ফেরৎ দেবে।

যাক তবু রক্ষা। কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র সার্চ হবে কেন? আমরা কি চোর? নাকি আমাদের বিপ্লবী দলের লোক ভেবেছে।

গেট খোলা হল। আমরা উঠানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাজাবাবুর ভাই আর ছেলে দাঁড়িয়ে রইল—দুজন দারোয়ান তন্ন তন্ন করে আমাদের জিনিস সার্চ করতে লাগল তারপর যার যার জিনিস তার তার কাছে ফেরৎ দিতে লাগল। নগেনদা কিন্তু এরই মধ্যে রাজাবাবুর ছেলের কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কি যেন আলাপ জুড়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আলাপের পর আমাদের কাছে এসে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে রাজাবাবুর মেয়ে একটা খুব দামী গলার মালা শোবার ঘরে রেখে বাথরুমে গেছিল। এসে দেখে ওটা নেই। মালাটায় নাকি হীরামুক্তা বসান ছিল। এত দামী ছিল মালাটা যে আমাদের কল্পনার বাইরে।

থাকগে আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি? আমাদের জিনিস পেলেই মিটে গেল।

জিনিসপত্র ফেরৎ পেলাম। রওনা দেব এমন সময় রাজাবাবু নেমে এলেন। ভয়ে-ভয়ে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। রাজাবাবু আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—ছেলেরা, তোমাদের
ফলা হল সেজন্য দুঃখিত হয়ো না। বিশেষ কারণেই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।
াত্রেই ত চলে যাবে, নানা কারণে খাওয়া ও হল না। তোমরা এই কুড়িটা টাকা
াষ্টি খেয়ে বাড়ী ফিরে যাও।

তখনকার দিনে কুড়ি টাকায় আমাদের পাবনা জেলাতে দুমণেরও বেশী রসগোল্লা পাওয়া
। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে—খেতে ওস্তাদ ছিলাম—তাহলেও কুড়ি টাকায় মিষ্টি পনের জন

ছেলের পক্ষে খাওয়া মুশকিল ছিল। রাজাবাবুর দারতায় আমাদের মনে যে রাগটুকু সঞ্চিত হয়েছিল তা উবে গেল। তাঁকে নমস্কার করে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বের হয়ে এলাম।

নগেনদা কিন্তু এতক্ষণ কি ভাবছিল। হঠাৎ আমাদের সঙ্গে না এসে রাজাবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর বিড়-বিড় করে কি আলাপ করতে লাগল। আমরা গেটের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। নগেনদা প্রায় আধঘণ্টা রাজাবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল, বলল চল সব।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম রাজাবাবুর সঙ্গে তার কি কথা হল। সে কিন্তু অম্লান বদনে বলল—কিছু না। থাকগে, তোরা বাড়ী চলে যা। আমি দিন কতক শহরে থেকে যাব। শহরে এলাম, বায়স্কোপ না দেখে যাই কি করে? একটু আনন্দ করে তার পর বাড়ী যাব।

আমরা রাজাবাবুর দেওয়া টাকায় ভরপেট ভাল ভাল মিষ্টি খেয়ে যে যার বাড়ী চলে গেলাম। নগেনদা থেকে গেল।

মাস কয়েক পরের কথা। নগেনদা এসে হাজির। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে বলল—কিরে! ফল বের হবে কবে?

রুমাল থেকে অগুরুর গন্ধ বের হচ্ছিল। চেহারার জৌলুসও বেড়েছে। পাঞ্জাবীটাও আমাদের তুলনায় অনেক ভাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—নগেনদা, চেহারা এত চকচকে হল কি করে?

নগেনদা বলল—চাকরি পেয়েছি রে। পঞ্চাশ টাকা মাইনে। খাওয়া থাকা ফ্রি।

পঞ্চাশ টাকা! আমাদের চোখ কপালে উঠল। তখনকার দিনে বি. এ. পাস করেও পঞ্চাশ টাকা মাইনে জুটত না, তার উপরে খাওয়া থাকা ফ্রি।

কোথায় চাকরি?

নগেনদা মিট-মিট করে হাসছে—সেই রাজাবাবুর বাড়ীতে।

কি চাকরি—কেন চাকরি দিল?—আমরা একযোগে চেঁচামেচি করতে লাগলাম।

তারপর নগেনদার কাছে শুনলাম তার চাকরির ইতিহাস। রাজাবাবুর ছেলের কাছে মালা হারাণোর ইতিহাস শুনেই নগেনদার মাথায় ফন্দি এসে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে বের না হয়ে ও রাজাবাবুকে গিয়ে বলল—হুজুর, যদি অভয় দেন ত একটা কথা বলি।

রাজাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—কি কথা?

—খোকা রাজাবাবুর কাছে শুনলাম খুকী দিদির মালা হারিয়েছে একটু অ
তাই প্রাসাদের কাউকে বেরোতে দেন নি বা প্রাসাদে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেন
জিনিসটা বাইরে পাচার না হয়। খুব ঠিক কাজ হয়েছে। যেই মালা নিক এই প্রাসাদেই সে
মালাও এই প্রাসাদেই আছে। হুজুর যদি অনুমতি দেন তবে আমি সে মালা বের করে দিতে পা

রাজাবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে নগে দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন—তুমি পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারব।…নগেনদা জোরের সঙ্গে বললেন।

—বেশ, কি করতে হবে বল।

—সে অনেক পরামর্শ হুজুর। আমি সাগর পাণ্ডার হোটেলে গিয়ে উঠব। আপনি যদি দয়া করে সেখানে একবার আসেন ভাল হয়। তবে কেউ ঘটনাটা না জানলেই ভাল। আপনি ড্রাইভার নেবেন না। খোকাবাবু গাড়ী চালাতে পারেন শুনেছি, তাঁকেই সঙ্গে নেবেন।

এই যুক্তির ফলেই নগেনদা থেকে গিয়েছিল।

তারপর রাজাবাবুর সাথে পরামর্শ অনুযায়ী দিন সাতেক বাদে নগেনদা চাকরের বেশে রাজাবাবুর বাড়ীতে হাজির হল। এই কয়দিন কেউ প্রাসাদে ঢুকতে পারে নি, কাউকে বাইরে যেতেও দেওয়া হয় নি। বাইরের লোক বাজার করে গেটের কাছে নামিয়ে দিত। রাজাবাবুর সাক্ষাতে সেই সব জিনিস দারোয়ান ভিতরে নিয়ে যেত। খুব কড়াকড়ি। রাজাবাবুর বন্ধুর বিশেষ সুপারিশ নিয়ে নূতন চাকর ধরণী এ বাড়ীতে নিযুক্ত হল। সাতদিনের মধ্যে একমাত্র সেই বাইরে থেকে এল এবং বাইরে যাবার অনুমতি পেল। মুখভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ীগোঁফ, কিছু কিছু ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে নগেনদা ধরণী চাকর হয়ে জমিদার-বাড়ীতে ঢুকল।

তার কাজ হল রাজাবাবুর লাইব্রেরী পরিষ্কার করা, তাঁর ব্যক্তিগত ফাই-ফরমাস খাটা আর খোকাবাবুকে কলেজে টিফিন দিয়ে আসা।

দিন পনের এই ভাবে কাটল। প্রাসাদের আইন এতটুকু শিথিল হল না। সবাই বিব্রত বিরক্ত হয়ে উঠল। নগেনদা চাকর মহলে থাকে—তাদের সঙ্গে খায়, গল্প করে, বিড়ি টানে। চাকরের বেশে থাকলেও লেখাপড়া জানা লোক ত। কিছুদিনের মধ্যে সবার মাথা হয়ে উঠল ধরণী। একদিন সন্ধ্যায় নানান রকমের গল্প হচ্ছে। হঠাৎ ধরণী বলল—রাজাবাবুর এই ব্যবহার আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। জিনিস হারিয়েছে—চাকরদের উপর সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা তাদের জিনিসপত্র সার্চ করা হোক—তা না যতদিন খুশী আটকে রাখা হবে, কেউ মহলের বাইরে যেতে পাবে না এ কেমনতর বিচার ?

একজন বলল—তবু ভাল যে থানায় খবর দেওয়া হয় নি বা দারোগা ডেকে অযথা মারধোর … গুঁড়ো করে দেওয়া হয় নি।

…লল—বাপু এটা তার চেয়ে ভাল।

…ন নানা রকমের গল্প শুরু হল। এমনই এক গল্পের মধ্যে নগেনদা এক গল্প ফাঁদল।…

…দিন আগে আমার কাকা শীতলাই জমিদার-বাড়ীতে চাকরি করত এই পাবনা শহরেই। …ভ সামলাতে না পেরে রাণীমার একখানা বাজু সুযোগ বুঝে চুরি করে বসেছিল। চুরি ত করল

কিন্তু মাল রাখে কোথায়? যেখানেই রাখুক জিনিস-পত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেই বেরিয়ে যাবে। শহরের মধ্যে বিক্রি করাও বিপদ। তাড়া-তাড়ি বুদ্ধি করে বাগানের এক কোণে পুঁতে রেখে এল জিনিসটা। কিন্তু তাতেও বিপদ আছে। মালী ফুলগাছ পুঁততে গিয়ে যদি বের করে ফেলে জিনিসটা। খুব চালাক লোক ছিল কাকা। জানতও অনেক কিছু। এই শহরের এক তান্ত্রিকের কাছে আসা-যাওয়া ছিল তার। তার কাছ থেকে এমন এক নজরবন্দী করার ওষুধ নিয়ে এল যে, ও স্থানটার ধারে কাছেও কেউ গেল না। দুইমাস ধরে পুলিস দারোগা সব জায়গা তন্নতন্ন করে ফেলল—কিন্তু নাঃ জিনিস আর পাওয়া গেল না। ধরাও কেউ পড়ল না। চার-পাঁচ মাস পরে যখন সব গোলমাল মিটে গেল তখন কাকা বাড়ী যাবার ছুটি নিয়ে বাজুটা উঠিয়ে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। সেখান থেকে একেবারে বর্দ্ধমান। কাকা জমিজমা কিনে চাষবাস করে মহা সুখে বাস করতে লাগল।

আরে বাবা—সুনীল বলে উঠল—আমাদের এই শীতলাই বাবুর বাড়ী! তবে ত সেই তান্ত্রিকও এই শহরেরই।

ধরণী বলল—হাঁরে! এখানেই হয়েছিল ঘটনা প্রায় বিশ বছর আগে। এখন গেছে, তাই প্রকাশ করলাম ঘটনাটা।

যদু সরকার বাবুর খাস খানসামা; সে বলল—তাজ্জব ব্যাপার—এমন নজরবন্দী জ ছিল নাকি পাবনাতে! এখন আর অমন মন্তর জানা লোক দেখা যায় না।

ধরণী বলল—সে তান্ত্রিক কন্তু এখনও আছে। বুড়ো হয়ে গেছে।

সুনীল বলল—কেমন সেদিন যে বলছিলা মন্তরের অনেক গুণ। যদুদা ত বিশ্বাসই করে না। এবার শুনলে ত চোখে দেখা কথা—হুঁ।

এরপর কে কত মন্ত্রশক্তি দেখেছে বা শুনেছে তার অনেক গল্প হল। তারপর যার যার মত শুতে চলে গেল। পরদিন খুব সকালে ধরণী বিছানা ছাড়তেই দেখে প্রয়াগ পাঁড়ে এসে বসে আছে।

ধরণী জিজ্ঞাসা করল, কি পাঁড়েজি—হঠাৎ এত সকালে?

পাঁড়ে তাকে যা বলল তাতে এই দাঁড়ায় যে তাকে ঐ তান্ত্রিকের ঠিকানা দিতে হবে। দেশে তার যে জমিজমা আছে তা নাকি এক বদমাইশ লোক সব হাত করেছে। তাকে সায়েস্তা করবার জন্য সে তান্ত্রিকের সাহায্য নেবে।

ধরণী ওরফে নগেনদা তাকে তান্ত্রিকের ঠিকানা দিল।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর সুনীল এল, ডাকল—কি ধরণীদা, ঘুমাচ্ছ নাকি?

ধরণী বলল—না, এখনই টিফিন নিয়ে যেতে হবে কলেজে।

সুনীল বলল—সত্যি ধরণীদা, রাজাবাবু তোমাকে বিশ্বাস করে আর আমরা হলাম অবিশ্বাসী সব। আচ্ছা ধরণীদা—সেই মন্তর জানা তান্ত্রিকের ঠিকানা কি তুমি জান?

নগেনদা বলল—হাঁ জানি, কেন?

সুনীল বলল—একটু ভাগ্য গণনা করাব। চিরকাল কি চাকর হয়েই থাকব না আর কিছু হব।

ধরণী ঠাট্টা করে বলল—না তুই এস্ ডি. ও. হবি।

সুনীল বলল—তাও একবার দেখাব।

নগেনদা তাকেও ঠিকানা দিল।

সন্ধ্যার আঁধারে চুপি চুপি এল সারদা ঝি, বলল—ওগো নূতন লোক, তোমার নাম যেন কি ভুলে গেছি। তুমি নাকি কাল যদুর কাছে এক তান্ত্রিকের গল্প করেছ, দাও দেখি তার ঠিকানাটা।

ধরণী বলল—কেন দিদি, তুমি তান্ত্রিকের ঠিকানা নিয়ে কি করবে?

সারদা বলল—কি আর বলব ভাই, একটাই ছেলে আমার। সে মানুষ হলে কি আর এই হয়? জাগ্রত তান্ত্রিকের কাছে মাদুলী নেব একটা, যদি তার মতিগতি বদলায়।

কেঁদে ফেলল। নগেনদা তাকেও ঠিকানা দিল।

এরপর ধরণী রাজাবাবুর কাছে গিয়ে বলল—পাখী সব এসে জালে বসেছে, জাল না গোটালে কোন ঠিক পাখী বোঝা যাবে না।

পরদিন প্রয়াগ, সারদা ও সুনীল পর পর এসে নগেনদাকে ধরল যে সে হল রাজাবাবুর বিশ্বাসী লোক, যদি বলে কয়ে তাকে একবার বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়াতে পারে তবে ভাল হয়।

ধরণী বলল—দূর পাগল, রাজাবাবু আমার কথা শুনবে কেন? তোরা বরং খোকাবাবুকে ধর।

রাত্রে এল যদু, সে এদিক ওদিক চেয়ে বলল—ধরণী ভাই, তুমি যদি আমার একটা উপকার কর।

ধরণী বলল—কি?

—তুমি ত বাইরে যাবার অনুমতি পেয়েছ। যদি আমাকে একবার বাইরে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার তবে বড় উপকার হয়।

ধরণী তাকেও খোকাবাবুর কাছে অনুরোধ করতে বলল।

এর পরে নগেনদা সবাইকে আলাদা আলাদা করে খোকাবাবুর কাছে নিয়ে গেল এবং আলাদা আলাদা ভাবে তাদের ডাক পড়ল রাজাবাবুর কাছে। চারজনই আলাদা আলাদা ভাবে অনুমতি পেল এবং কেউ অন্যের কথা জানল না।

দিনও পড়ল পর পর—সন্ধ্যার সময়।

ওরা যখন বেরোত তার আধঘণ্টা পরেই খোকাবাবু ধরণীকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়তেন।

এমনই করে দুইদিন কাটল। সুনীল প্রয়াগ বেরিয়ে এল। তৃতীয় দিন সারদার পালা, কিন্তু তার শরীর খারাপ হয়েছে বলে আর গেল না। চতুর্থ দিনে যদুর ছুটি। যদু সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেল। খোকাবাবু আর ধরণী তারপরে যথারীতি বেরোল।

তারপরের ঘটনা এক মজার কাণ্ড।

রাত প্রায় দুটো। দেখা গেল প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম দিকের গোয়ালের দিকে দুজন লোক আস্তে আস্তে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা চৌকো দেশী লণ্ঠন, একদিকে কাচ লাগান, মধ্যে একটা মিটমিটে মোমবাতি বসান; কাচের দিকটাও কাপড় দিয়ে ঢেকে আস্তে আস্তে চলেছে। তারপর দেখা গেল লণ্ঠনটা মাটিতে রাখল। তারপর মাটিতে বসে যেই কিছু করতে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ব্যাটারীর দুটো টর্চের আলো তাদের উপর পড়ল। আলোতে সব পরিষ্কার। যদু আর সারদা হতভম্ব হয়ে দুজন দাঁড়িয়ে গেল। পুলিসের হুইসেলের তীব্র আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে লুক বেরিয়ে এসে দুজনকে ধরল। রাজাবাবু খোকাবাবু দারোগা সবাই দোতলা থেকে ভয়ে সারদা অজ্ঞান হয় হয় আর কি! দারোগাবাবুর হুকুমে মাটিতে যেখানে সিঁদুর দেওয়া আছে সেখানটায় খোঁড়া হল। একটু খুঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল একটা ঘটি। ঘটির মুখ দু

দিয়ে বাঁধা। টাকা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল সেই টর্চের আলোয় তার হীরা-মুক্তাগুলি ঝলমল করে উঠল।

দারোগা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, এটা কি? সঙ্গে সঙ্গে এক থাপ্পর যদুকে। তারপর যেই সারদার দিকে এগিয়েছে, সারদা হাঁউমাউ করে কেঁদে দারোগার পা জড়িয়ে ধরল। দারোগা এক লাথি দিয়ে বলল—যদি সব বলিস তবে মারব না, না হলে আজ তোর কানে গরম সীসা ঢেলে মারব।

সারদা কেঁদে কেটে যা বলল তাতে প্রকাশ পেল, যদু অনেকদিন থেকে সারদাকে কিছু গয়না চুরির পরামর্শ দিচ্ছিল। দুজনেই খুব তক্কে তক্কে থাকতে থাকতে একদিন সুবিধে পেয়ে গেছিল। তার পরের ঘটনা ত সবাই জানে।

দারোগা দুজনকে বেঁধে থানায় নিয়ে চলল।

মালা পাবার পরদিন নগেনদা গিয়ে রাজাবাবুকে বলল—আমার কাজ ত ফুরিয়েছে, এবার আমায় বিদায় দিন।

রাজাবাবু বললেন—বিদায় দেব কি হে! তোমার মত বুদ্ধিমান লোক আমার দরকার। তুমি থেকে যাও, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে আর এখান থেকে খাওয়া পাবে।

সেই থেকে নগেনদা ওখানেই আছে।

আমরা বললাম—ব্যাপারটা তা হলে কি দাঁড়াল?

নগেনদা হেসে বলল—তাও বুঝলি নে হাঁদারাম সব? ঐ তান্ত্রিক সত্যিই পাবনা শহরের লোক। তাকে সব কথা বলে আগে থাকতেই সব ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। কেউ যদি মিথ্যা নামে ফুল সিঁদুর নিয়ে আসে সেজন্য তান্ত্রিক আগে থেকেই বলে দিয়েছিল যে মিথ্যা নাম ধাম দিলে কিন্তু মন্ত্রে ফল হবে না। সুনীল আর প্রয়াগ সত্যি সত্যি তাদের কথামতই গিয়েছিল। যদু সারদাকে দিয়ে ঠিকানা নিয়েছিল কিন্তু গিয়েছিল নিজে। আমরা ত রোজই তান্ত্রিকের কাছে যেতাম। যেদিন তান্ত্রিক বলল যে যদু এসেছিল মন্ত্র নিতে আর গোয়ালের উত্তর-পশ্চিমে মাটিতে ওটা পোঁতা আছে, আমরা থানায় খবর দিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিলাম।

আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলাম—নগেনদা আমাদের সার্লক হোমার। এবার মিষ্টি খাওদাও নগেনদা। তোমার পরীক্ষা দিতে যাওয়া এবার সার্থক।

নগেনদা হাসতে হাসতে পাঁচটা টাকা বের করে বলল—আন মিষ্টি!

একটি প্রতিভা

॥ জীবনকৃষ্ণ দাস ॥

বিচিত্র শখ! হাট থেকে পাখি কিনে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেওয়া। তারপর মুক্ত পাখির দিকে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়া। তার সে প্রাণান্ত হাসির দিকে মুগ্ধদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে হাটের জনতা! তাকে চেনে সবাই, নামও জানে! নাম তার লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। বিশ বছরের অজ্ঞাত কুলশীল এক যুবক।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির যেমন কোন সঠিক পরিচয় নেই, নেই তেমনি জন্মের সঠিক তারিখও। ১৪৫২ খ্রীষ্টাব্দের কোনও একটি দিনে ইটালীর কোনও এক অখ্যাত ঘরে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখে কেঁদে উঠেছিল হতভাগ্য লিওনার্দো। জন্মের সাথে সাথে তাকে ত্যাগ করেছিলেন তার হৃদয়হীন পিতামাতা।

লিওনার্দোর শৈশব ও কৈশোরের ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন। আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি ইটালীর এক হাটে। লাল পোশাকে রঞ্জিত, ঘাড়ছোঁয়া উজ্জ্বল সোনালী চুলে অপূর্ব দেহসুষমার এক সুন্দর যুবকরূপে - যে নাকি খাঁচা খুলে পাখি উড়িয়ে দিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। তাকেই আমরা চিনি। তার নাম লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। শিল্পী হিসেবে সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যাঁর নাম।

অল্প বয়সেই লিওনার্দো খেলাধূলায়, ঘোড়ায় চড়ায় খুব পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সুন্দর ব্যবহার আর সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত! অনেকে ভবিষ্যৎবাণী করত, এ ছেলে একদিন বড় হবে। বলা বাহুল্য যে, সে ভবিষ্যৎবাণী থাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

আজ সারা পৃথিবীর লোক জানে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি একজন মস্ত বড় শিল্পী ছিলেন! চিত্রশিল্পী হিসাবেই ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত। মোনালিসা দেলগিও কোন্তার এক বিচিত্র ছবি তিনি এঁকেছেন—যার ঠোঁটের দুর্বোধ হাসির অর্থ আজও খুঁজে পান নি পৃথিবীর বড় বড় শিল্পীরা! সেই ছবি এঁকেই তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে!

কিন্তু এই শিল্পসৃষ্টিই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়! এ ছাড়াও তাঁর অজস্র গু
শুধু গুণ বললেই তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয় না। যেমন চিত্রশিল্পে তিনি পারদর্শিতা দে
অন্যান্য বিষয়গুলিতেও সমান মনীষার পরিচয় দিয়েছেন।

অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যায় তিনি অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। শিল্পসাধনায় মগ্ন থেকেও জ্যামি

জ্ঞানের উপর তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হোল। তুলি ছেড়ে দিয়ে তিনি জ্যামিতি নিয়ে বসলেন। ক্রমে ক্রমে রং-তুলির কথা একসময় ভুলেই গেলেন।

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে ক্লান্ত অবসরে যখন তিনি তাকাতেন অবারিত আকাশের দিকে, তখন তাঁর যৌবনের স্মৃতি মনে পড়ে যেত—সেই হাট থেকে পাখি কিনে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেওয়ার কথা! চকিতে একটা জিজ্ঞাসা তাঁর মনে দোলা দিয়ে যেত—মানুষ কি পারে না ঐ মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াতে! সে জিজ্ঞাসাটাকে কিন্তু তিনি আর বেশীদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারলেন না! তাই নিয়ে তিনি গভীর গবেষণায় ডুবে গেলেন। তার সে প্রচেষ্টা সার্থক হোল! তিনিই সর্বপ্রথম উড়োজাহাজ আবিষ্কার করলেন। পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে অমন অসাধারণ জ্ঞান ছিল বলেই লিওনার্দো উড়োজাহাজ তৈরী করতে পেরেছিলেন। এ ছাড়াও এনজিনিয়ারিং এবং ফসিলের উৎপত্তি নিয়েও তিনি অনেক মৌলিক গবেষণা করে গেছেন।

এ সব ছেড়ে দিয়ে শুধু একটা কথা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। যে নরম হাত দিয়ে লিওনার্দো মোনালিসার ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই হাত দিয়ে তিনি কি করে শব-ব্যবচ্ছেদ করলেন! 'অ্যানাটমি'র (দৈহিক গঠন বিষয়ক বিদ্যার) জ্ঞান অর্জন করলেন! কি করে সেই হাত দিয়ে সর্বপ্রথম জীবদেহের শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচলের পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব হোল—তা' সত্যিই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য!

তাছাড়া যে মন সরস সঙ্গীত আর শিল্পের সাধনায় মগ্ন ছিল, সে মন কি করে বিজ্ঞানের মত নীরস জটিল বিষয় নিয়ে সার্থকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করল! একদিকে শিল্প-সঙ্গীত, অন্যদিকে বিজ্ঞান—যা নাকি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। যার মধ্যে তেল আর জলের মত প্রবল বৈষম্য বিদ্যমান! একটার সাথে অন্যটার মিল হয় না। লিওনার্দোর বহুমুখী প্রতিভা সে বৈষম্যকে অতিক্রম করে এক অসম্ভব লোকে পৌঁছেছিল।

লিওনার্দোই সর্বপ্রথম একা অসংখ্য শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। মানবদেহের বিভিন্ন অংশের বিশদ বর্ণনা এবং নির্ভুল চিত্র এঁকে গেছেন। লিওনার্দোর পূর্বে মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এবং কঙ্কালের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল তার অধিকাংশই কাল্পনিক। লিওনার্দোই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কঙ্কালের নির্ভুল চিত্র অঙ্কিত করেন। মাতৃগর্ভে সন্তান যে অবস্থায় থাকে লিওনার্দোই সর্বপ্রথম চিত্র এঁকে গেছেন।

অসুবিধার মধ্য দিয়ে লিওনার্দো 'অ্যানাটমি'র জ্ঞানলাভ করেছিলেন। কেননা সেই ...নরা শিক্ষার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ ঘৃণার চোখে দেখত। অন্যান্য বিষয়ে তারা হৃদয়হীন শব-ব্যবচ্ছেদ সইতে পারত না। এর জন্য একদিন লিওনার্দো মহাশক্তিশালী পোপের ...রাগভাজন হলেন। পোপ তাঁকে হৃদয়হীন বলে সমাজচ্যুত করলেন। 'অ্যানাটমি'র গবেষণা

তাঁর বন্ধ হোল। তবুও ওই অল্প সময়ের মধ্যে অ্যানাটমি'র যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন—তখনকার দিনের অন্য কোন চিকিৎসকের তা ছিল না। 'অ্যানাটমি'র জ্ঞান বিষয়ে তিনি একশ' কুড়িখানি পুস্তক রচনা করেছেন, এবং প্রায় সাতশ' চিত্র অঙ্কিত করে গিয়েছেন—যার কাছে বর্তমান সভ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে ঋণী। তাই তাঁকে 'অ্যানাটমি'র জনক বলা হয়।

লিওনার্দোর এই আবিষ্কারের কথা, এই সম্পদের কথা কিন্তু পরবর্তী দুইশত বৎসর ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। তাঁর এই প্রতিভার কথা, তাঁর এই আবিষ্কারের কথা—তাঁর বংশধরেরাও দু'শ বছরের মধ্যে জানতে পারে নি।

তাঁর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেল ১৭৮৪ সালে। 'অ্যানাটমি' সম্পর্কে তিনি যে শত শত চিত্র এঁকে গেছেন, যে সমস্ত পুস্তক রচনা করে গেছেন, তা' আবিষ্কার করেন উইলিয়াম হান্টার—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সার্জন জন হান্টারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিই প্রথম সেই গুপ্তধনের সন্ধান দেন।

সুতরাং দেখা যায় তখনকার দিনে লিওনার্দো একাধারে ছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই বললেও যেন তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট কিছু বলা হয় না। বিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষ শাখায় তাঁর গবেষণা সীমায়িত ছিল না। তিনি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবতত্ত্ববিদ ছিলেন—তেমনি চীফ এঞ্জিনিয়ার এবং উড়োজাহাজের আবিষ্কারক ছিলেন।

লিওনার্দো যে কত বড় অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন, তা' আমাদের সাধারণের ধারণার অতীত। তাঁর মত বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এত রূপ, গুণ এবং অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও লিওনার্দোর জীবনটা ছিল—এক দুঃসহ বিড়ম্বনায় ভরা। জন্মের সাথে সাথে পিতামাতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি যেমন পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত ছিলেন—তেমনি তাঁর দেশ, সেই সময়কার সমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল।

কিন্তু মানুষের পরিচয় তার কর্ম। তার প্রতিভা, পিতামাতার পরিচয় মানুষকে অমরত্ব দিতে পারে না। মানুষের কর্ম, মানুষের প্রতিভা তাকে অমরত্ব দেয়।

কাজেই মানুষ লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন—তারাই তাঁর পরিচয় বহন করবে। ইতিহাস তাঁকে মাতৃস্নেহে বুকে জড়িয়ে রাখবে চিরকাল।

স্কুলে ওদের যে ভূগোল পড়ান হয়েছিল তাতে লেখা ছিল—পৃথিবীর উত্তরে সুমেরু অঞ্চল, বরফের দেশ। সবুজের চিহ্নটুকুও সেখানে নেই। উত্তর মেরু সাগরের জলও বরফাচ্ছন্ন থাকে। এই বরফের দেশে বছরের কোন সময়েই সূর্যালোক লম্বভাবে পড়ে না। তাই সারা বছরই ওখানে শীতের রাজত্ব। তবে সূর্য যখন উত্তরায়ণে আসে সেই সূর্যালোকে এই বরফের দেশ আলোকিত হয় আর প্রায় ছটি মাস সূর্যের মৃদু আলোক বরফের দেশে ছড়িয়ে থাকে। এরই নাম মেরুজ্যোতি। বাকী ছটা মাস সূর্যের মুখ দেখা যায় না। বরফের দেশ তখন অন্ধকারের দেশে পরিণত হয়। শীতের কামড় হয় তখন আরও তীক্ষ্ণ। উত্তর মেরু সাগরের জল যেটুকু গলেছিল তা আবার এই সময় জমে যায়। সীলমাছগুলো বরফের নীচে আশ্রয় নেয়। শ্বেত ভল্লুকরা বরফের গর্তে ঢুকে পড়ে। বরফের দেশে তখন আর প্রাণস্পন্দন শোনা যায় না।

এই যে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত্রির দেশ এখানে বাস করে একদল বিচিত্র মানুষ।
...বীর ... দেশের সঙ্গে আচার-আচরণ হাব-ভাবের কোথাও তাদের মিল নেই। তারা বরফের
...বরফের উপর লালিত-পালিত হয়, বরফের মধ্যে জীবিকা অর্জন করে—শেষ নিঃশ্বাসও
...ন। এরা এস্কিমো। বল্গা-হরিণ, শ্বেত-ভল্লুক, মেরু কুকুর আর সীলমাছ এস্কিমোদের
...। শুধু প্রতিবেশী নয়, এদের ওপর নির্ভর করেই তারা দেহ ধারণ করে।

একদিন ডক্টর গ্রীণের স্টাডিতে কথাটা পাড়ল অরুণাংশু। ওদিকে যাত্রার দিন ঠিক হয়ে

গেছে। প্রস্তুতিও সব শেষ। একটা নূতন আর বিচিত্র দেশ দেখতে যাচ্ছে।—যাওয়ার আগে সেই দেশ আর তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। আর ডক্টর গ্রীণ নিশ্চয় এস্‌কিমোদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জানেন। নর-গোষ্ঠীর কোন দলে তারা পড়ে আর কত যুগ ধরে তারা বংশ পরম্পরায় এই বরফের রাজ্যে বাস করছে তা জানা দরকার।

অরুণাংশু তাই ডক্টর গ্রীণের কাছে এস্‌কিমোদের অতীত ইতিহাস জানতে চাইল—স্যার, এস্‌কিমোরা ঠিক কোন্ দেশে বাস করে আর তুন্দ্রা অঞ্চল বলতেই বা কোন্ জায়গাটাকে বোঝায়? এ কথা আমি বলছি এই জন্যে যে এশিয়া-ইউরোপের সঙ্গে উত্তর আমেরিকার যে যোগসূত্র রয়েছে তা মেরু অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রলম্বিত। মেরু অঞ্চলের একদিকে ইউরোপ-এশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল আর একদিকে উত্তর আমেরিকার উত্তরের বরফাচ্ছন্ন দেশগুলো। এদের মাঝখানে বিশাল মেরু মহাসাগর—বছরের বেশীর ভাগ সময় তার জল বরফাচ্ছন্ন থাকে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের কোন্ জায়গাটা এস্‌কিমোদের আদি বাসস্থান? আর সর্বত্র কি একই জাতির মানুষ বসবাস করে?

ডক্টর গ্রীণ হাতের মোটা বইখানা রেখে বললেন—ওদের সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট পড়ছিলাম। এস্‌কিমোদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে আরও কয়েকবার সরকারী উদ্যোগে আলাস্কা থেকে গ্রীণল্যাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত বরফের দেশে অভিযান করা হয়েছিল। আমাদের পূর্বসূরীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন। এই বইখানা ঐ রকম একটা অভিযানের রিপোর্ট। ওদের সম্বন্ধে যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা তোমাকে বলছি।

উত্তর মেরুর মানচিত্র সম্বন্ধে তুমি যা বললে তার সবটা ঠিক নয়, মিত্র। পৃথিবীর মানচিত্র যদি ভালভাবে দেখ তা হলে বুঝতে পারবে যে উত্তর মেরু সাগর অনেকটা হ্রদের মতন। তার প্রায় চারদিক ঘিরে রয়েছে স্থলভাগ। ইউরোপের উত্তরভাগ থেকে একেবারে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। বেরিং প্রণালী পার হয়ে শুরু হয়েছে আলস্কা—বরফে ঢাকা দেশ। আলাস্কা থেকে গ্রীণল্যাণ্ডের পূর্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এস্‌কিমোদের দেশ বলে বর্ণিত। আমরা এই অঞ্চলটার কথাই এখানে বলব। কেননা ইউরোপে অবস্থিত তুন্দ্রা অঞ্চল প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত। উভয় দেশেই এস্‌কিমো জাতি বাস করে সত্য। তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা দুটি বিভিন্ন জাতি।

—আচ্ছা স্যার, এই দুটো অংশ কি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন?

—হাঁ। একদিকে বেরিং প্রণালী আর অন্যদিকে উত্তর সাগর, এই দুটো জলপথের মাধ্যমে মেরু সাগরের জল প্রশান্ত মহাসাগর ও অতলান্তিক সাগরের সঙ্গে মেশে। উত্তর ... বিস্তৃতি প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল। উত্তর মেরুর কেন্দ্রবিন্দু তাই উত্তর মেরু সা... অবস্থিত। কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু সব সময় বরফাচ্ছন্ন থাকে। কেননা মেরু সাগরের সব জায়গার ... গরম কালে গলে না।

—দক্ষি , মেরুও কি ঠিক এমনি ধরণের, স্যার ?

—না। দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দু স্থলভূ তে। আর সেই স্থলভূমির চারদিক ঘিরে অবস্থান করছে দক্ষিণ মেরু সাগর। দক্ষিণ মেরু এই জন্যই আজও জন-মানবহীন। কেননা পৃথিবীর অন্যান্য স্থলভাগ দক্ষিণ মেরু থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। দুরধিগম্য মহাসাগর তাকে বেষ্টন করে রয়েছে।

—স্যার, উত্তর মেরু সাগরের জল কি সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে ?···অরুণাংশু আবার জিজ্ঞাসা করল। ডক্টর গ্রীণের কথা তার খুব ভাল লাগছিল। ওঁর বলবার ধরণ এবং প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তথ্য শুনে অরুণাংশু সমগ্র বরফের দেশটা যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

ডক্টর গ্রীণ বললেন—না না, তা কেন হবে ? উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলের সমুদ্রজল সারা বছর জমাট বরফে পরিণত থাকে। তবে আরও দক্ষিণের বরফ গলে যায়। আর তখন বরফ-নদীগুলোর দু'তীরে সরু ঘাস আর ছোট ছোট চারাগাছের ঝোপ জন্মায়। তাদের আয়ু খুবই স্বল্প। কেননা কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালেই তুন্দ্রা ভূমির কিছুটা অংশ বরফ-মুক্ত হয়। সে-সময় প্রাকৃতিক শোভা হয় অদ্ভুত। কল্পনা করতেই পারছ মিত্র, চারদিকে শ্বেত বরফের স্তূপ। সেই মর্মর-স্তূপ ধীরে ধীরে গলছে। জমে-থাকা বরফ-নদীতে চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। দু'তীরে মাথা তুলেছে সবুজ সমারোহ। কোথাও কোথাও রঙীন ফুলেরা মাথা দোলাচ্ছে। আর সেই সবুজের সমারোহে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে বল্গা-হরিণ আর ক্যারিবু হরিণের দল। কোথাও কোথাও লোমওয়ালা ষাঁড়ের দল সবুজ ঘাসগুলো খুঁটছে। আর এই সময় সারা বরফ-দেশে প্রাণের লক্ষণ চোখে পড়ে।

—বড় বড় গাছ কি মেরু-প্রদেশে একদম জন্মায় না ?

—না। জন্মাবে কখন বল ? মাত্র দু'তিন মাস ত সময়, তারপর ত আবার বরফ জমে ঢাকা পড়ে যাবে সমস্ত অঞ্চলটা। বড় বড় গাছ তাই একেবারেই জন্মায় না। উত্তর মেরু সাগরের জল সূর্যালোকে বাষ্পে পরিণত হয় না, তাই গ্রীষ্মকালে যখন অতলান্তিকের বুকে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় তখন উত্তর মেরু সাগর থেকে শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। বরফের স্তূপ এই স্রোতে অতলান্তিকে গিয়ে পড়ে।

হাঁ। তাই এই সময় খুব সাবধানে জাহাজ চালাতে হয়। ডুবো বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অনেক সময় জাহাজ ডুবে যায়।

শুর মনে পড়ল টাইটানিকের কাহিনী। মস্ত বড় যাত্রিবাহী জাহাজ। তার অধ্যক্ষ করেছিল যে, এই জাহাজ সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াবে। ডুববে না। কিন্তু ডুবো বরফের পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেই টাইটানিক ডুবে গেল। পর থেকে কত বছর পার হয়ে গেছে। টাইটানিকের চেয়েও বড় বড় জাহাজ তৈরী হয়েছে।

কিন্তু ডুবো বরফ-পাহাড়ের ভয়ে নাবিকরা আজও সশঙ্কিত। গ্রীষ্মকালে উত্তর অতলান্তিক আর উত্তর সাগরে তারা খুব সাবধানে জাহাজ চালায়।

সেদিন আসবার সময় ডক্টর গ্রীণ ওকে একখানা ছোট বই দিয়ে বলেছিলেন —এই বইখানা পড়ে নিও মিত্র। বরফের দেশ আর এস্‌কিমোদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে এতে। পড়লে ওদের সব কথা জানতে পারবে। অবশ্য এখানে শুধু আলাস্কা থেকে গ্রীণল্যাণ্ড পর্যন্ত অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে।

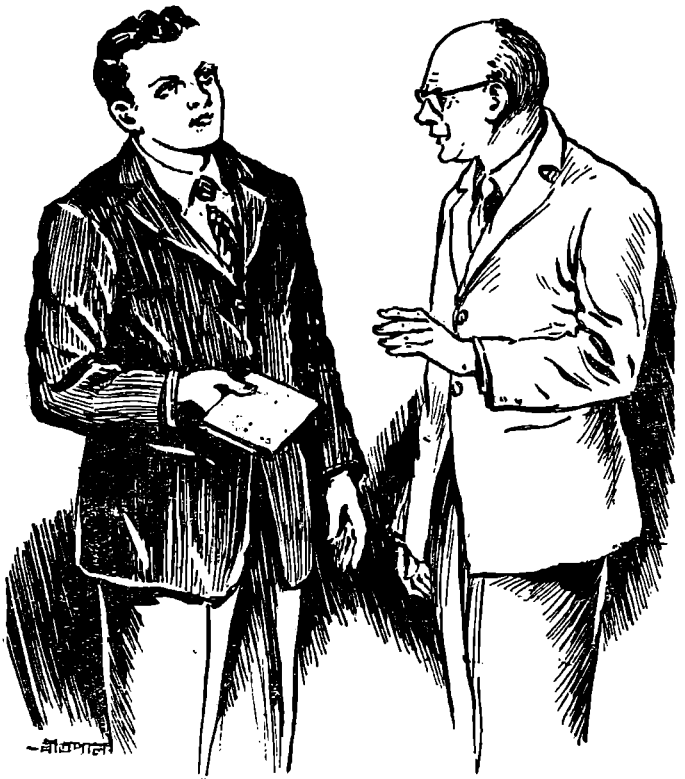

আসবার আগে বইখানা ভাল করে পড়েছে অরুণাংশু। আলাস্কা থেকে গ্রীণল্যাণ্ডের পূর্বাংশ পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল মেরু মণ্ডলে অবস্থিত। এর মধ্যে পড়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা, কানাডার উত্তরাংশ এবং সমস্ত গ্রীণল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ। এ ছাড়া আছে বফিন, এলিস্‌মিয়ার দ্বীপপুঞ্জ, ভিক্টোরিয়া দ্বীপ এবং এমনি আরও অনেক ছোট বড় দ্বীপ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ভূতত্ত্ববিদরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছেন। আর নৃতত্ত্ববিদরা এই পাঁচ অংশেই এস্‌কিমো নর-গোষ্ঠীর মানুষরা প্রাচীনকাল থেকেই বাস করছে তার প্রমাণ পেয়েছেন। আলাস্কা, ম্যাকেঞ্জি প্রদেশ, মধ্যাঞ্চল, গ্রীণল্যাণ্ড আর ল্যাব্রাডর—এই পাঁচটা অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহাকৃতি প্রায় একই রকম। মাঝারি গড়ন, চওড়া মুখমণ্ডল, উঁচু চোয়ালের হাড় আর ছোট ছোট চোখ। ওদের মাথা অস্বাভাবিক রকম লম্বা ধরণের—অনেকটা ছুঁচলো। দেহের রঙ গৌর—কিন্তু ঠাণ্ডা হ লালচে। কিছু কিছু এস্‌কিমোর মুখ ভীষণ লাল—কিন্তু অন্যান্য এস্‌কিমোরা ওদের অভিশং করে। এল্‌কিমো-সমাজে ওরা ঘৃণার পাত্র।

পূর্বে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, বেরিং প্রণালী পার হয়ে সাইবেরিয়া প্রান্তরের উত্তরাং

থেকে একদল এস্‌কিমো আলাস্কা অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। তাঁদের মতে সাইবেরিয়া এস্‌কিমো-গোষ্ঠীর নর-নারীর আদি বাসস্থান। সেও আজ কয়েক হাজার বছর আগেকার ঘটনা। আলাস্কা অঞ্চল থেকে এই এস্‌কিমোদের একটা অংশ রেড-ইণ্ডিয়ানদের তাড়া খেয়ে পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এমনি ভাবে এস্‌কিমো নর-গোষ্ঠী পশ্চিম থেকে পূর্ব-সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এস্‌কিমোদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। আগে এস্‌কিমোরা নিজেদের বলত ইন্নুইৎ (Innuit)—অর্থাৎ মানুষ। অনেকের ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী ধর্মযাজকরা ওদের এই নামকরণ করেন। এস্‌কিমোদের নাম হল আমশের। এস্‌কিমো কথার অর্থ কাঁচা-মাংস-ভক্ষণকারী।

গ্রীণল্যাণ্ডে এস্‌কিমোদের বাস সব চেয়ে বেশী। শিকার করা জন্তু-জানোয়ারের মাংসের উপর এদের জীবন নির্ভরশীল। শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে পঁচিশ ডিগ্রী কম উত্তাপের আবহাওয়ায় চাষ-বাস একরকম অসম্ভব। তাই ওদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা খাদ্যাভাব। খাদ্যের খোঁজে এরা এক জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায় সরে যায়।

ভূতাত্ত্বিকদের কয়েকটি আবিষ্কারের ফলে বেরিং প্রণালীর কাছাকাছি জায়গায় মাটির নীচ থেকে এস্‌কিমোদের ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ঠিক আজকাল আলাস্কার এস্‌কিমোরা কাঠ-কাঠরা দিয়ে যে রকম ঘর তৈরী করে তেমনি সব ঘর। ওদের ব্যবহার করা মাটির প্রদীপ, ছবি-আঁকা থালা-বাসন, হারপুন, কিয়াক-নৌকা পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে পাতলা কাঠ দিয়ে তৈরী গগল্‌স—বরফের উজ্জ্বলতা থেকে চোখ বাঁচাবার জন্য ওরা এখনও এই ধরণের গগল্‌স তৈরী করে। এরা এখনও পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ বজায় রেখেছে।

কানাডার উত্তরে যে এস্‌কিমো গোষ্ঠী বাস করত তাদের নাম থুল জাতি (Thule)। মাটি খুঁড়ে ওদের পাথরের তৈরী ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এরা ক্যারিবু্য হরিণ শিকার করত। কানাডার মধ্যাঞ্চলের এস্‌কিমোরা এদের বংশধর। শীতকালে এরা হারপুন দিয়ে তিমি, সীল আর সিন্ধুঘোটক শিকার করে। গ্রীষ্মকালে এরা ক্যারিবু্য হরিণ শিকার করে। এদের বংশধররা এখন মধ্য-অঞ্চলের এস্‌কিমো জাতি।

গ্রীণল্যাণ্ড এবং লাব্রাডরের বরফের নীচ থেকে ভূতত্ত্ববিদরা প্রাচীন এস্‌কিমো-জাতির ব্যবহৃত যে-সব ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন তা' থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, পূর্বাঞ্চলের এস্‌কিমোরা পশ্চিম-অঞ্চলের এস্‌কিমোদের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল। সাম্প্রতিক এই আবিষ্কারে এস্‌কিমোদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে নূতন মতের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে ধারণা ছিল বেরিং প্রণালীর [illegible]বেরিয়া থেকে এস্‌কিমো-জাতির অনুপ্রবেশ ঘটে আলাস্কায়। তারপর পনের থেকে [illegible] বছর পূর্বে যখন রেড ইণ্ডিয়ানদের পূর্বপুরুষরা বেরিং প্রণালী পার হয়ে এশিয়া থেকে আমেরিকায় প্রবেশ করল তখন তাদের কাছে পরাজিত হয়ে এস্‌কিমো-জাতির লোকেরা [illegible]রও পূর্বে সরে গেল। যদি তাই হত তা হলে পূর্বাঞ্চলের এস্‌কিমোরা কিছুতে পশ্চিমাঞ্চলের

এস্‌কিমোদের চেয়ে সভ্য হতে পারে না। সুতরাং পণ্ডিতদের ধারণা এই যে, বেরিং প্রণালী পার হয়ে সাইবেরিয়া থেকে এস্‌কিমো-জাতির লোকদের অনুপ্রবেশের পূর্বেই উত্তর আমেরিকায় একদল এস্‌কিমো বাস করত। গ্রীণল্যাণ্ড, লাব্রাডর ও হাডসন উপসাগরের কাছাকাছি ছিল ওদের আদি বাসভূমি। আর পশ্চিমাঞ্চলের এস্‌কিমোদের চেয়ে ওরা ছিল অনেকটা সভ্য।

আর এই এস্‌কিমোদের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যই ডক্টর গ্রীণ চলেছেন। আলাস্কা থেকে ক্রমশঃ পূর্বদিকে গ্রীণল্যাণ্ড পর্যন্ত ওঁরা এগিয়ে যাবেন। আর এর জন্য অনেকদিন ধরে প্রস্তুতি চলেছে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা করার জন্য বেতার স্টেশন নির্মিত হয়েছে। জায়গায় জায়গায় পাথরের ঘরও করা হয়েছে। একস্থান থেকে আর একস্থানে যাওয়ার জন্যে রয়েছে হেলিকপ্টার বিমান।

এমন একটা অভিযানে সহকারী হওয়ার সুযোগ লাভ করে অরুণাংশু নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছে। শুধু দেশটাই দেখা হবে না, সেই দেশের ইতিহাস, তার সংস্কৃতি সব কিছু জানতে পারবে ডক্টর গ্রীণের কাছ থেকে। (ক্রমশঃ)

নতুন বছরে

॥ শ্রীঅতীন মজুমদার ॥

অনেক দিনই কাটিয়ে দিলাম মায়ের আঁচল ধ'রে
রূপকাহিনীর গল্প শুনে' স্বপ্নে দু'চোখ ভ'রে।
ঘুমিয়েছিলাম কত না রাত জুজুবুড়ির ভয়ে,
এই জীবনের কিছু সময় মিছেই গেল বয়ে।
এসো এবার পণ করি ভাই, ঘরের কোণে আর
রইবনাক, ঘুচাব এই মনের অন্ধকার।
এ দেশটিকে জানব এবার—দেখব দু'চোখ খুলে,
ক্ষুদিরামের আমরা যে ভাই সে কি গেলাম ভুলে'!

রূপকাহিনীর গল্পে শোনা 'সোনার কাঠি' ভাই
নয়ক মিছে,—সে যে মোদের মনের ইচ্ছেটাই।
সোনার এ দেশ মোদের স্বদেশ—সবাই মিলে ভাই
এসো মনের ইচ্ছে দিয়ে এ দেশ গড়ে' যাই।
মিথ্যে-মেকীর, ফক্কিকারীর রইবেনাক লেশ,
রইবেনাক লোভ-লালসা, রইবে না বিদ্বেষ।
সবার তরে সবাই হব পরম আপনজন,
হৃদয়ে হৃদয়ে হবে প্রেম-রাখীবন্ধন।

এই দেশেতে জন্ম নেবে যারা ভবিষ্যতে—
তাদের তরে বিপদ-বাধা রইবে না আর পথে।
দুঃখবিহীন সবার মনে রইবে খুশী ভরা,
কল্প-লোকের স্বর্গ দেবে এই মাটিতে ধরা!

আবার এপ্রিল মাস এসেছে। ইংরেজরা পহেলা এপ্রিলকে 'অল ফুলস্ ডে' পালন করে। ঐ দিন তারা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন নিয়ে নানা রকম রঙ্গতামাসা করে। একবার একজন ভদ্রলোক নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপিয়ে পাঠালেন—নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা হন্তদন্ত হয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে দেখেন 'এপ্রিল ফুল' করা হয়েছে। এপ্রিল মাসটির সূচনা হয় এমনি হাল্কা আনন্দ রসের মধ্য দিয়ে। কোন কোনও কবি এপ্রিলকে 'নির্ম্মম' 'নির্দ্দয়' মাস বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু সারা এসিয়া ভূখণ্ডে এপ্রিল হচ্ছে আনন্দ-উৎসব—বসন্তোৎসবের মাস। জাপানে প্রচণ্ড শীতের শেষে প্রথম উজ্জ্বল আলোক দেখা দেয় এই এপ্রিল মাসে—শীতে ঢাকা, মৃত-ঝরা-পাতা চেরীফুলের ডালে ফুল ফুটতে সুরু হয় এই এপ্রিল মাসে। চারিদিকে চলে উৎসবের আনন্দ—জাপান-কোরিয়া-তাইওয়াম প্রভৃতি দেশে এখন মধুর বসন্ত কাল সুরু হ'ল। ফিলিপিন, বোর্নিও, মালয়েশিয়া ও তাইল্যাণ্ডে রুদ্র-প্রচণ্ড গরমের মাস এখনও আসতে বিলম্ব রয়েছে। কাজেই নাতিশীতোষ্ণ এই এপ্রিল মাস আনন্দের দিন।

ব্রহ্মদেশে এই এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নূতন বর্ষ উৎসব সম্পন্ন হয়—তিন দিন তাদের জলকেলি উৎসব 'ওয়াটার ফেষ্টিভ্যাল' (Water Festival) বা 'মহাথিংগান' (Maha Thingan Festival) বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সিংহলে এই মধ্য এপ্রিলে আরম্ভ হয় তামিলদের নববর্ষ উৎসব এবং খাঁটি সিংহলী ও তামিলীদের আনন্দোৎসব কাল এই মাসেই ধার্য্য হয়েছে। সমস্ত পরিবারের লোকেরা এই সময়ে বসন্তকালের উৎসবে মেতে যায়।

হংকংএ এই এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে চলে চিং মিং (Ching Ming) উৎসব—এই সময়ে এরা পিতৃপুরুষদের সমাধিস্থল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এবং নানারূপ আনন্দ উৎসব করে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

জাপানেও এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে হয় 'হানামাৎসুরী' (Hana Matsuri) বা বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব। এই সময়ে জাপানের লোকেরা বিরাট উৎসব আনন্দে মেতে উঠে। সারা জাপানে

এই সময়ে চলে আনন্দোচ্ছ্বাস। বহু মন্দিরে জাপানের ছেলেমেয়েরা উৎসবের পোষাক পরে বিরাট শোভাযাত্রা বের করে। দেশ-বিদেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জাপানে আসেন এবং তাঁরাও তাঁদের প্রাচীন বৌদ্ধ পোষাক পরে বিরাট মিছিল শোভাযাত্রা বের করেন। জাপানের এই 'হানামাৎসুরী' দেখবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পর্য্যটক জাপানে এসে হাজির হন।

কোরিয়াতে এই এপ্রিল মাসে চেরীফুলের উৎসব হয়, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে চেরীফুল ফুটে সারা বাগান ভরে উঠে। ফুলের কাছে যেমন মৌমাছির দল পিলপিল করে, ঠিক তেমনি লোকেরা চেরীফুল দেখবার জন্য ভীড় করে এদের পার্কে পার্কে—ঠিক ঐ মৌমাছির ঝাঁকেরই মত।

জাপানে পি. সি. সরকারের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে টিকিট-ক্রেতা
জনতার বিরাট লাইনের একাংশ

লাওস দেশে এই এপ্রিল মাসে 'ফি মা' (PHI MA) উৎসব হয়। এটিও নববর্ষ উৎসব। এই দেশীরা এইদিন একে অন্যের গায়ে জল দেয় যাতে তার সমস্ত দুঃখ, পরিতাপ, পাপ ধুয়ে মুছে যায়। আমরা হোলি উৎসবে যেমন পিচকারী দিয়ে রং দেই এরা একে অন্যের গায়ে তেমনিভাবে জল ছুড়ে দেয়। জল যে দেয় এবং যাকে দেয় দুইজনই খুশী—দুইজনই আনন্দ পায়।

মাকাও দেশে এই মাসে হয় এদের দেবতা 'আ-মা' আনন্দোৎসব (Goddess A-MA

Festival)। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'মাকাও'এর সমস্ত ধীবরেরা সে দেশের 'মা-কোক-মিও' (MA-KOK MIO) দেবতার মন্দিরে তিনদিন সমাগত হয় এবং তাদের দেবী 'নিয়াং মা' (NEUNG MA)-এর পূজা অর্চ্চনা ও উৎসব করে। এই দেবীর নাম থেকেই তাদের দেশের নাম 'মাকাও' হয়েছে।

মালয়েশিয়াতে এই এপ্রিল মাসে 'কোং টেক সান ওং' (KWONG TECK SUN ONG)-এর জন্মদিন মহাসমারোহে পালিত হয়। চীনা পঞ্জিকা অনুযায়ী দ্বিতীয় চান্দ্রমাসের ২২শ দিনে সারাবাক সহরে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ওকিনাওয়াতে এপ্রিল ম্যসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হানামাৎসুরী হয়। তারা এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব পালন করে। মন্দিরে গিয়ে হাতলে করে এক প্রকার মিষ্টি চায়ের জল বালক বুদ্ধমূর্ত্তিতে ঢেলে দিয়ে তাকে স্নান করিয়ে দেয়। আমাদের দেশে যেমন শিবের মাথায় জল ঢেলে দিয়ে থাকে ঠিক তেমনি।

ফিলিপাইনএ এই এপ্রিল মাসে ইষ্টার উৎসব হয়। খৃষ্টদের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী এরা পবিত্র বুধবার থেকে 'ইষ্টারমনডে' (সোমবার) পর্য্যন্ত বিরাট উৎসব করে—বিরাট শোভাযাত্রা বের করে এবং সারা দেশ উৎসব-আনন্দে মেতে উঠে।

তাইল্যাণ্ডএ এই মাসে 'সংক্রান উৎসব' (SONCKRAN Festival) হয় এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এটা এদের ধর্ম্মীয় উৎসব ছিল—এখন এটা আনন্দোৎসবে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তির মাথায় জল দেওয়া হয়, তারপর পিতামাতা, গুরুজন, বয়স্থ আত্মীয়স্বজনকে জল দেওয়া হয়—এতে তাঁদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আমাদের গুরুজনের পায়ে আবির দেওয়া আর এদের গুরুজনের গায়ে জল দেওয়া একরকম ব্যাপার। তাইল্যাণ্ডের ভাষা ভারতের ভাষার খুবই কাছাকাছি। এরা দেখা হলে বলে "নমস্কাণ" অর্থাৎ আমাদের 'নমস্কার'; এরা টেলিগ্রাফবাড়ীকে বলে 'তারঘর' —সবই আমাদের বাংলাভাষার কাছাকাছি। কাজেই এদের 'সংক্রান' উৎসব আমরা 'সংক্রান্তি' উৎসব মনে করতে পারি। আমাদের দেশের 'চৈত্র সংক্রান্তি', নববর্ষ উৎসব সবই কি এই সময়ে হয় না?

যত দেখি—যত চিন্তা করি সর্ব্বদা মনে হয় আমরা প্রাচ্যের সমস্ত দেশ যেন এক সুরে বাঁধা—আমরা একই রকম আবহাওয়ায় বাস করি। সকলেই প্রধানতঃ অন্নভোজী—ধর্ম্ম সকলেরই প্রায় একই রকম—সকলের মনের তন্ত্রী এক লয়ে বাঁধা।

তবে কেন এই হানাহানি—কেন এই ভেদবিসম্বাদ? ঘৃণা-ঈর্ষ্যা-পরশ্রীকাতরতা-অসূয়া জয় করে পারি না কি আমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে মিল করে থাকতে? এপ্রিলের এই আনন্দোৎসব আমাদের সমাজ-জীবনে সেই নূতন অভিজ্ঞানের সঞ্চার করুক। জগতে সুখ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হোক।

ছড়া

হাট্টিমা টিম পাখী

॥ সাজ্‌জাদ উদ্‌দীন আহ্‌মদ ॥

হাট্টিমা টিম পাখী
তাদের বালুচরে ঘর।
তারা সেথায় করে বাস,
তারা নয়কো কারো পর।

হাট্টিমা টিম টিম—
তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
তারা তা ধিনা ধিন ধিন
কেবল নাচে সারা দিন।

হাট্টিমা টিম পাখা
আমি খবর তাদের রাখি।
বলি জানতে কিছু চাও?
শুনেই তবে নাও:

হাট্টিমা টিম টিম
তাদের অনেক খবর আছে;
যদি আলাপ করতে চাও
তবে যেও তাদের কাছে।

এক রাতের ভূত

॥ করবী গুপ্ত (গ্রাঃ নং ১৮৪৮৫) ॥

এক ভীষণ ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম।

তখন রাত একটা। পরীক্ষা সামনে। বসে বসে পড়ছিলাম। সবাই ঘুমিয়ে আছে। কিছুক্ষণ আমারও বেশ ঘুম পাচ্ছিলো। বইটা রেখে আলোটা নিবিয়ে বিছানায় উঠতে যাবো, এমন সময়ে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়লো। ভয়ে গা শিউরে উঠলো। দেওয়ালের গায়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে বড় একটা চোখ। আবার আলোটা জ্বালালাম, কৈ কিছুই নেই তো! আবার নিবিয়ে দিলাম —সঙ্গে সঙ্গে সেই চোখ ভেসে উঠলো।

পাশের ঘরে বড়দি শুয়েছিলেন। ডাকলাম, 'বড়দি!' গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। আবার ডাকলাম। বড়দি সাড়া দিলেন, 'কিরে কি হয়েছে?'

'উঠে এসো না, এখানে কি একটা যেন—'

বড়দি এসে আলো জ্বালতেই আর কিছু নেই। এমনি করে কয়েকবার পরীক্ষা করবার পর বড়দিও ভয় পেয়ে গেলেন। এমনিতেই বড়দি বেশ ভীতু। বাড়িতে পুরুষ

মানুষ কেউ নেই। তাই পাশের বাড়ির লোকদের চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে তো শব্দ বেরোয় না। আবার বৃষ্টি পড়ছে। কি ভয়াবহ রাত! অনেক ডাকাডাকির পর পাশের বাড়ির লোকেরা এলেন। এত রাতে চোর না কি হবে ভেবে ওঁরা লাঠিসোটা হাতে করে এলেন। সবাইকে ঐ চোখটা দেখানো গেলো। কেও কিছু বুঝতে পারলেন না। বুঝলাম ওঁরা বেশ ভয় পেয়েছেন। একজন বেশ সাহস দেখিয়ে বললেন, 'কিছু না, আমি দেখছি।' বলেই যেখানটায় চোখ জ্বলছিলো সেখানটায় লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন। আশা ছিলো ভূতের চোখ গলে যাবে। কিন্তু লাঠি 'ঠক' শব্দ করে ফিরে এলো। এরপর শাবল দিয়ে দেওয়ালের প্লাস্টার খানিকটা তুলে লোকটি বললেন, 'এবার আর ভয় নেই।' কিন্তু যেই অন্ধকার করা হলো অমনি সেই জ্বলজ্বলে চোখটা ভেসে উঠলো। এবার ভদ্রলোকের মুখটা শুকিয়ে গেলো। দু'চারজন যারা কাছে ছিলেন তাঁরা মুখ চাওয়াচায়ি করে 'এ ভূতের ফাও' বলে মন্তব্য করে সরে গেলেন।

'আমি আবার দেখছি' বলে ভদ্রলোক উঠোন থেকে এক খাবলা কাদা নিয়ে সেই গর্তকরা জায়গাটা ভর্তি করে বললেন, 'আর ভয় নেই।'

কিন্তু অন্ধকার হতেই চোখটা আবার জ্বলে উঠে সবাইকে ভয় দেখাতে লাগলো। বাইরে তুমুল ঝড় বইছে। এবার যেন চোখটা বেশ কাঁপতে শুরু করেছে। এবার ভদ্রলোক আমাদের সাহস দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, রাতে দরকার হলে ডাকবেন।' বলে সরে পড়লেন।

ভয়ে আমাদের গা ছমছম করতে লাগলো। আলোটা জেলে রেখে সবাই রাম নাম নিয়ে শুয়ে পড়লাম চোখটাকে পেছনে রেখে। কিন্তু সবাই একজন আরেকজনের অলক্ষ্যে চোখটাকে দেখে নিচ্ছি। রাত তিনটে বাজলো। পাশের ঘরের জানালাটা মনে হলো আস্তে আস্তে খুলে গেলো একটা 'ক্যাচ' শব্দ তুলে।

'বড়দি, জানালাটা কি খোলা ছিল?'

বড়দি বললেন, 'বন্ধই তো ছিল মনে হয়, কিন্তু পাশের ঘরে কিসের শব্দ হলো?'

কান পেতে বসে আছি—এ কি! বললাম, 'বড়দি, শুনছো!'

বড়দিরও ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। আমাদের ফিসফিসানিতে ভয় পেয়ে বড়দির বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে দিলো।

পাশের ঘরের দেওয়ালে একটা এস্রাজ ঝুলানো আছে, মাঝে মাঝে যেন তাতেই টুং টাং শব্দ হচ্ছে। হাওয়ায় শব্দ হচ্ছে? না—তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। ক'দিন আমাদের পাড়ায় একটি মেয়ে মারা গেছে। সে ভালো এস্রাজ বাজাতো। এখন নাকি প্রায়ই সে আসে। একা ঘরে আপনা থেকে এস্রাজ বাজতে থাকে। তবে কি তাই? আমাদের এস্রাজের ওপরেও তার নজর পড়লো?

দুজনের মনেই এক কথা জাগছে। হঠাৎ দরজা-জানালাতে কতগুলো ঢিল এসে পড়লো

দুমদাম করে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। বড়দি বললেন, 'কিসের শব্দ রে? হাওয়ায় গাছের জামরুলগুলো পড়লো?'

ভীষণ জোরে দরজার পরদাগুলো নড়তে লাগলো। ঘরে যেন কিসের ছায়া। চোখটা তো জ্বলছেই, মাঝে মাঝে বেশ কাঁপছে। আতংকে সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে এলো। হয়তো এক্ষুণি এসে গলা টিপে ধরবে। যাক গলা টিপে আর ধরলো না। এমনি ভাবে বসে বসে রাত শেষ হলো।

দিনের বেলা ঘরে কিছুরই চিহ্ন নেই। শুধু কাদা-লাগানো দেওয়ালটা কুৎসিত হয়ে আছে। ওটার দিকে তাকানো যায় না, অজান্তে ভয় এসে গলা টিপে ধরে। সারাদিনে আমরা কেউ আর এ ঘরে একা ঢুকি না। এক রাতের ভয়ে আমাদের সবার চেহারা এমন হয়ে গেছে যেন কতদিন রোগে ভুগে উঠেছি। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা নেই, শুধু চিন্তা আবার রাত আসছে।

সারাদিন কত লোক এলো, কিন্তু কেউ আর প্রতিকার করতে পারছে না। সবাই বলছে, 'ভূত ছাড়া কিছুই না।'

দিন গেলো, রাত এলো। সন্ধ্যেবেলা সমস্ত বাড়িতে ভালো করে ধূপধুনো দিয়ে এ ঘরে বেশী করে ধূপ জ্বেলে শাঁখ বাজিয়ে বসে আছি। এমন সময় মাস্টাররশাই এলেন। মনে একটু সাহস এলো। তাঁকে ঐ চোখটার কথা বললাম। তিনি খুব সাহস দেখিয়ে বললেন, 'চল দেখি কি ব্যাপার?'

আলো জ্বালিয়ে নিবিয়ে খুব কসরত করলেন কতক্ষণ। তিনি বললেন, 'দেখো তোমার দাদা-বাবুকে একটা খবর পাঠাও বাড়ি আসবার জন্য আর একটা ওঝা ডাকো। ভালো করে পুজো টুজো কর। ব্যাপার ভালো ঠেকছে না—ভৌতিকই মনে হয়। আর হ্যাঁ দেখো আজ আমার শরীরটা বিশেষ ভালো না, কাল এসে পড়াবো।' এই বলে মাস্টারমশাই পালিয়ে গেলেন।

কি আর করি, আমরা তো অসহায়। গালে হাত দিয়ে ভাবছি আজকের রাত কি করে কাটবে। বাইরে আজও টিপ টিপ বৃষ্টি হচ্ছে। এই অবস্থায় আবার ঝিটা আজ বড়দিকে বলে গেছে, 'দেখো মা, এতদিন তোমায় কিছু বলি নি। রাতের বেলায় আমি পুকুরে যেতে পারি না গো। ঐ তেঁতুলগাছটায় পা ঝুলিয়ে সাদা কাপড়পরা একটি মেয়েমানুষকে প্রায়ই দেখা যায়।'

এসব শুনে অবধি মনের জোর একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। চুপ করে বসে আছি বাইরের ঘরে।

হঠাৎ বড়দি আমায় বললেন, 'হ্যাঁ রে যে দেওয়ালটায় চোখটা জ্বলছে তার উল্টো দিকের দেওয়ালে একটা ভেন্টিলেটার আছে, তাই না রে?'

'হ্যাঁ' জবাব দিলাম আমি। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। বড়দি আবার বললেন, 'ভেন্টিলেটারটা গোল?'

'হ্যাঁ তো। তাতে কি হয়েছে?' বললাম আমি।

'না, কিছু না।' বড়দি বললেন। হঠাৎ আবার বললেন, 'আচ্ছা আমি দেখছি ভূতটা কোথায় থাকে। ভূত না ভূতের বাবা দেখছি।'

শোবার ঘরের দরজা খুলে বড়দি ঢুকলেন, পেছনে আমরা সবাই রয়েছি। বড়দি একটা চেয়ার টেনে ভেন্টিলারের নীচে রেখে তাতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটা লাঠির মাথায় বেশ খানিকটা ন্যাকড়া জড়িয়ে ভেন্টিলেটারের গায়ে চাপা দিয়ে বললেন—'আলোটা নিবিয়ে দে তো।'

আমি কথামত কাজ করলাম। ঘর অন্ধকার।

'দেখ তো চোখটা দেখা যায় কিনা।'

কি আশ্চর্য! না তো। আবার ন্যাকড়াটা সরিয়ে নিলে—চোখটা ভেসে উঠলো। আবার চাপা দেওয়া হলো, চোখ নেই। বড়দি হেসে বললেন, 'এবার ভূতের বাবার শ্রাদ্ধ কর। রাম রাম কি বোকামিটাই না করলাম সারাটা রাত। রাস্তার লাইটপোস্টের আলো এসে পড়েছিলো ভেন্টিলেটারে, তারই ছায়া পড়েছিলো দেওয়ালে। অনেকদিন যাবৎ বাল্ব ছিলো না, তাই আলোও জলে নি। নতুন বাল্ব দিয়েছে তাই এই বিভ্রাট।'

* পাততাড়ি সাহিত্য সভায় (১৩৭০) দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা। *

ভোর হয়েছে

॥ মৃগেন্দ্রকুমার বেরা (গ্রাঃ নং ১৭২৯৪) ॥

পূবের আকাশ রাঙিয়ে গেছে
ডাকছে পাখী দূরে,
ভোর হয়েছে, এখন থোকন
ঘুমোও কেমন করে ?
পশ্চিমেতে চাঁদমামা ঐ
যাচ্ছে ধীরে সরে,
ফুলের বনে ফুল ফুটেছে
মৌমাছি গান ধরে।
রাখাল ছেলে যাচ্ছে মাঠে
সঙ্গে গরুর পাল,
মাঠের রাস্তা আঁকাবাঁকা—
ধারে খেজুর-তাল।

মাঝিরা ঐ পাল তুলেছে
ছাড়লো বুঝি তরী,
চলবে এবার সুদূর পানে
নাইকো মোটেই দেরী।
বাউল এবার নামলো পথে
একতারাটি নিয়ে,
বকের সারি চলছে উড়ে
আকাশপথটি দিয়ে।
বইছে মৃদু দখিন বাতাস
নাচছে নদীর জল,
শালুক বনে ফুটলো শালুক
ছুটছে হাঁসের দল।

আকাশে আর নেইকো তারা
নেইকো অন্ধকার,
ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে—
জাগো তো এইবার।

জিভকাটা চড়ুইটি

॥ ছন্দা দিন্দা গ্রাঃ নং ১৮৪৯০) ॥

এক যে ছিল বুড়ো। তার ছিল এক বউ। বুড়ো আর তার বউ জাপানের একটা পাহাড়ের উপরে থাকত। বুড়োর বউ ছিল দারুণ ঝগড়াটে, তার দাপটে বুড়োর অবস্থা কাহিল। বুড়োর ছিল এক পোষা চড়ুই। চড়ুইটাই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। বুড়োর দজ্জাল বউ কিন্তু পাখীটাকেও দু' চোখে দেখতে পারত না।

একদিন বুড়ো গেল মাঠে কাজ করতে। বুড়োর বউ সেদিন টব ধুচ্ছিল। ধোয়া মোছার দিন বউয়ের মেজাজ যেত বিগড়ে, কেননা, পরিষ্কার করতে করতে তার পিঠ ব্যথা হয়ে যেত। বউ খানিকটা আঠাল খাবার তৈরী করে ঠাণ্ডা করার জন্য কাঠের পাত্রে রেখে কাজ করতে গেল। এসে দেখে বুড়োর পোষা চড়ুইটা পাত্রের ডালায় বসে বেশ মজাসে খাবারটা খাচ্ছে। রাগে তার হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। তাড়াতাড়ি সে পাখীটাকে ধরে কাঁচি দিয়ে কচ্ করে তার জিভটা কেটে দিলে। বললে, চুরি করার এই শিক্ষা, যা দূর হয়ে যা।

পাখীটাকে উড়িয়ে দিল সে। বেচারা রক্তমাখা অবস্থায় কাতরাতে কাতরাতে কোথায় উড়ে গেল।

বুড়ো ফিরে এল বাড়ীতে। কাণ্ড শুনে সে রেগে টং। দুজনে অনেক রাত্রি অবধি ঝগড়া করল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। বেচারা বুড়োর সংসারে ঝগড়াটে বউ ছাড়া আর কোন সঙ্গী রইল না।

কয়েকমাস পরে একদিন বুড়ো যাচ্ছিল পাহাড়ের উপর দিয়ে। এমন সময় খুব মিহি গলায় কে যেন বলল, শুভ প্রভাত। বুড়ো চেয়ে দেখে তার সেই পোষা চড়ুইটা মানুষের মত কথা বলছে। পাখীটার জিভ কেটে দেওয়ার জন্যই সে এখন মানুষের মত কথা বলতে পারছে। দুই বন্ধু অনেক দিন পর দুজনকে পেয়ে খুব খুসী। চড়ুই তখন বুড়োকে তার বাসায় চড়ুই-গিন্নী আর ছেলেমেয়েদের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। বুড়ো চলল তার সাথে। চড়ুই পরিবারের বাসাটা বাঁশ দিয়ে তৈরী। খাসা বাসা। সেখানে ঝরণা আছে, আছে বাগান আর নুড়ি। চড়ুই-গিন্নী বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল বুড়োকে। বুড়োর জন্য সে আনল মিষ্টি জেলি আর দুধ ডিম মিষ্টি মেশান খাবার, এ ছাড়া অন্য খাবারও আনা হল। চড়ুইয়ের মেয়ে উৎসবের চা তৈরী করে অতিথিকে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে চায়ের পাত্র এগিয়ে দিল। আমরা আপনাকে যা দিয়েছি তা খুবই সামান্য—চড়ুই-গিন্নী বলল। আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন আশা করি, কেননা আমাদের হাতে বেশী আয়োজন করার মত সময় ছিল না।

বুড়ো তো সকলের আন্তরিকতা দেখে ভারী আনন্দ পেল। সে অনেক কাপ চা খেয়ে নিল। সে রাতটা সে ওখানেই কাটাবে বলে ঠিক করল। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল বুড়ো চড়ুইয়ের বাড়ীতে আছে। এখানকার দিনগুলো তার ভারী আনন্দে কাটতে লাগল। পাঁচ দিনের দিন বুড়ো ভাবল এবার তো আমাকে বাড়ী ফিরতে হয়। চড়ুইটাকে জানাল বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা। চড়ুইয়ের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, সে বুড়োকে তাদের কাছ থেকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একটা

উপহার নিতে অনুরোধ করল। চড়ুই দুটো হাতে বোনা ব্যাগ আনল। তার মধ্যে একটা ভারী আর অন্যটা হাল্‌কা। বুড়ো হাল্‌কা ব্যাগটিই নিল আর বন্ধুকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

তোমরা হয়ত ভাবছ বুড়োর বউ বুড়োকে অনেক দিন পর বাড়ীতে আসতে দেখে খুব খুসী হল। কিন্তু মোটেই তা নয়। বুড়ো বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই দজ্জাল বউ তার সঙ্গে লাগিয়ে দিল ঝগড়া। বুড়ো তখন সব ঘটনা খুলে বলে তাকে ব্যাগটা দেখাল। বউ তখন টানাটানি করে ব্যাগটা খুলে ফেলল। ব্যাগ ভর্ত্তি অজস্র দামী মণি-মুক্তো আর সোনা। একটা টুপিও ছিল, সেটা মাথায় দিলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে যায়। আর ছিল একটা মন্ত্রের বই—সেই বই পড়ে যা চাওয়া হবে তাই পাওয়া যাবে। আরও ছিল টাকায় ভর্ত্তি একটা মাণি-ব্যাগ। তার থেকে যত টাকাই বার করা হোক না কেন সেটা ভরাই থাকবে।

বউয়ের ছিল দারুণ লোভ। সে ভাবল এবার আমি যদি যাই, তা হলে আমিও একটা উপহার পাব। বুড়ো তাকে থামাবার জন্য অনেক চেষ্টা করল; কিন্তু কোন ফল হল না। সে বলল, আমাদের এই একটা ব্যাগেই হেসে খেলে জীবন কেটে যাবে। আর কী দরকার আমাদের?

কিন্তু বউ কোন কথা গ্রাহ্য না করেই পথের নিশানা জেনে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

যখন সে চড়ুইয়ের বাড়ীতে পৌঁছল, তখন সে নিজেকে খুব ভদ্র আর বিনয়ী দেখাবার চেষ্টা করল, কিন্তু স্বভাব যায় না মলে। চড়ুই তাকে দেখে মোটেই খুসী হয় নি। তার ছেলে মেয়ে বা গিন্নী কেউই ঝগড়াটে বউয়ের সামনে এল না। সে চায়ের কাপ শেষ করল। তারপর তার জন্য কোন উপহার আনা হচ্ছে না দেখে সরাসরি উপহারটা আনার জন্য বলল চড়ুইকে। চড়ুই নিজের ঠোঁটের দিকে একবার তাকাল। তারপর দুটো ব্যাগ আনল—অবিকল সেই আগের ব্যাগের মত ব্যাগ। বউ তাড়াতাড়ি ব্যাগটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিজের বাড়ীর দিকে। চড়ুইকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা তার একবারও মনে হল না।

বাড়ী এসেই সে বুড়োকে এক চোট নিল; বলল, তুমি একের নম্বর আহাম্মক, তা নইলে ছোট ব্যাগটা আনলে কেন? আমার কেমন বড় ব্যাগ, নিশ্চয়ই এই ব্যাগে তোমার ব্যাগের দুগুণ জিনিস আছে।

তাড়াতাড়ি ব্যাগটা খুলে ফেলল সে। ব্যাগের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একটা অক্টোপাশ আর একটা চুলের মত সরু আর লম্বা সাপ। অক্টোপাশ তার আটটা পা দিয়ে বউকে বেঁধে ফেলল আর সাপটা তাকে পাকের পর পাকে জড়িয়ে যেতে লাগল যতক্ষণ সে না মরে। বুড়োকে এই ভীষণ জন্তু দুটো কিছু করল না। বুড়োর বউয়ের লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু হল।

বুড়ো এবার একটা পুষ্যি ছেলে নিল। সেই ছেলেকে ভদ্র আর বিনয়ী হতে শেখাল আর শেখাল লোভ করতে নেই কখনও।

কুয়েলালামপুরের ডলার পোড়ানোর যাদু

॥ যাদুকর এ. সি. সরকার ॥

মালয় দেশের রাজধানী কুয়েলালামপুর। ছিমছাম সাজানো-গোছানো ছোটখাটো শহর একখানা। রবার, টিন আর নানা সামগ্রীর ব্যাপারীদের নিত্য আনাগোনা হয় এখানে। ভারতীয়, চীনা আর মালয়ী লোকজনে ভরপুর। অন্য বিদেশীরাও আসেন প্রচুর।

এই কুয়েলালামপুর শহরেই সেবার আমার সঙ্গে আলাপ হল এক সিংহলী যাদুকরের। নাম শিভানেশন। লোকটা তামিল-ভাষী। সিঙ্গাপুরের সিলোন তামিল এসোসিয়েসনের অন্যতম কর্মকর্তা মিঃ কানডাইয়ার মধ্যস্থতায়ই হল পরিচয়। সিঙ্গাপুরের সাংবাদিক সমিতি আমার যাদুর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসাবে মেডেল ও কাপ পুরস্কার দেবার জন্য যে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন সেই অনুষ্ঠানেই আমার প্রথম পরিচয় হয় মিঃ কানডাইয়ার সঙ্গে।

যাদুকর শিভানেশন যাদুর খেলা দেখাচ্ছিলেন মালয়ান এস্টাব্লিশমেণ্টের অফিসে এক প্রমোদানুষ্ঠানে। মিঃ কানভাইয়া পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। যাদুকর শিভানেশন সোৎসাহে বললেন, "মিঃ এ সি. সরকার! আপনি? আপনি যাদুকর এ. সি. সরকার? আপনার কত সুনাম শুনেছি। এখানে তো সবার মুখে আপনার সুনাম!"

তাঁর এই উচ্ছ্বাসে অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম, তাই তাঁকে অন্য প্রসঙ্গে পরিচালিত করার জন্য বললাম, "বলুন আজকে কী কী খেলা দেখাচ্ছেন?"

বিনীত ভাবে উত্তর করলেন তিনি, "কী আর দেখাব মিঃ সোরসার, এই টুকিটাকি কয়েকটা খেলা। ভাল কথা, আপনার ডলার পোড়ানোর খেলাটার কৌশলটা যদি বলে দেন তবে এই অনুষ্ঠানে দেখাতে পারি। আপনার ঐ খেলাটার খুব সুনাম এ দেশে।"

ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়াতে পারসাম না। তাঁকে শিখিয়ে দিলাম ডলার পোড়ানোর খেলাটার মূল রহস্য।

এসো তোমাদেরও শিখিয়ে দিই :

খেলা শুরু করার আগে নিতে হবে একই রকমের দুটো খাম। এর একটা রাখবে খেলার জন্য আর অন্যটা লুকিয়ে রাখবে পোশাকের মধ্যে। এর পরে খেলা দেখানোর সময়ে দর্শকদের কাছ থেকে একটা দশ টাকা বা পাঁচ টাকার নোট চেয়ে নেবে।

এই নোটের নম্বর টুকে রাখতে বলবে দর্শকদের। খেলা দেখানোর জন্য রাখা খামটার মধ্যে নোটটা পুরে নিয়ে খামের মুখ বন্ধ করবে। এর পরে টেবিল থেকে দেশলাই তুলে নেবার সময়ে যখন দর্শকদের দিকে ক্ষণিকের জন্য পেছন ফিরবে তখন নোট ভর্তি খামটাকে টেবিলে রেখে পোশাকের ভেতরে লুকানো খালি খামটা হাতে নেবে আর সেই খালি খামটাতেই আগুন লাগাবে। ঠিক ভাবে এই খাম পাল্টানোর কাজটা করতে পারলে দর্শকেরা কিছুই বুঝতে পারবেন না। তুমি যখন খাম পোড়াতে ব্যস্ত থাকবে তখন টেবিল সরানোর অছিলায় তোমার সহকারী নোটশুদ্ধ খামটা সরিয়ে ফেলবে আর গ্রীণ রুমে গিয়ে খাম খুলে নোটটা বের করে এনে সবার অজান্তে কোন অছিলায় তোমার হাতে তুলে দেবে।

খাম পুড়ে যে ছাই হবে সেই ছাই-এর একটুখানি তুলে নিয়ে তুমি দু'হাত দিয়ে রগড়াতে থাকবে আর এই সময়ে তোমার হাতে লুকানো ভাঁজকরা নোটটার ভাঁজ খুলে ফেলবে। এই দেখে দর্শকেরা ভাববেন বুঝি ছাই থেকেই নোটের নবজন্ম লাভ হল পোড়া নোটটার।

মালয় দেশে সফরকালে এই খেলা দেখিয়ে আমি খুব সুনাম পেয়েছিলাম সেবার। হাতের চালাকীতে আমি আস্ত কমলালেবুর ভেতর থেকে পুড়ে যাওয়া নোটটাকে বের করতাম অক্ষত অবস্থাতে। এ দেখে দর্শকেরা হতেন আরও বেশী অবাক। দর্শকদের হাতে নোটটা ফেরত দিতে তাঁরা সবাই ব্যস্ত হয়ে মিলিয়ে দেখতেন যে নোটের নম্বর ঠিকই আছে।

বিদেশী গল্পগুচ্ছ

(২) চার্লস্ ডিকেন্স

॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ॥

অনেক অনেক দিন আগের কথা বলছি। একদিন অবাক হয়ে সবাই দেখলো, ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডনের কোনো এক পল্লীর রাস্তায় একটি শিশু পড়ে আছে। তার মা-ও পাশে পড়েছিলো। সে মৃত।

ছেলেটি দেখতে ভারী সুন্দর। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হোলো। কিন্তু ওর আত্মীয়স্বজন কাউকে কোথাও পাওয়া গেলো না।

সে যুগে ইংল্যাণ্ডে এ রকম দাবিদারহীন শিশুদের বড় করে তোলবার দায়িত্ব নিতেন মিশনারী সাহেবেরা। জনসাধারণ এবং সরকার উভয়পক্ষ থেকেই এজন্য মিশনারীদের টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করা হোতো।

মিশনারীরা এজন্য কর্ম্মচারী রাখতেন, তাঁরা ঐ সব দাবিদারহীন শিশুদের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণতঃ কোনো মহিলার ওপরে এই শিশুদের লালনপালনের ভার দেওয়া হোতো। এজন্য তাঁরাও মিশনারীদের কাছ থেকে টাকা পেতেন। এই ছেলেটির দায়িত্ব দেওয়া হোলো মিসেস মান নামে এক মহিলার ওপরে। এই মহিলা এ রকম অভিভাবকহীন আরও কয়েকটি শিশুর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এসব শিশুর লালনপালনের জন্য যে টাকা তিনি পেতেন তার বেশীর ভাগই তিনি কিন্তু ওদের জন্য খরচ করতেন না, নিজেই নিয়ে নিতেন। তাতে বাচ্চাদের খুব কষ্ট হোতো।

নিয়ম ছিলো, বয়স একটু বাড়লে পরে বাচ্চাদের রাখা হোতো সরকারী অনাথ আশ্রমে। একেও সেই নিয়মে অনাথ আশ্রমে পাঠানো হোলো। এ

সময় তার বয়স মাত্র নয় বছর। ভালো কথা, বলতে ভুলে গিয়েছি, ঐই ছেলেটির নাম হচ্ছে অলিভার টুইস্ট। একে নিয়েই গল্প।

অলিভার অনাথ আশ্রমে আসবার আগে সেখানকার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা মোটামুটি মন্দ ছিলো না। কিন্তু সে আসবার পরে ব্যবস্থা খারাপ হয়ে গেলো। সেখানকার কর্ম্মচারীরাও ভারী খারাপ ব্যবহার করতো ঐ বাচ্চাদের সাথে। এ নিয়ে অনাথ আশ্রমের বাচ্চারা করলো বিদ্রোহ। ফলে অলিভারকে অনাথ আশ্রম ছাড়তে হোলো।

অনাথ আশ্রমের পরে সে আর এক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে এলো। সেখানেও তার ওপরে খুব অত্যাচার করা হোতো। তাই সেখান থেকেও সে পালালো।

সে সেখান থেকে এসে হাজির হোলো লণ্ডনের উপকণ্ঠে এক ছোট্ট শহরে। এ শহরের নাম বার্নেট। সুদীর্ঘ পথ চলে ভারী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো অলিভার। ঘুমে তার চোখ আপনা থেকেই যেন বন্ধ হয়ে আসছিলো। সে রাস্তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙবার পর তার সাথে পরিচয় হোলো তারই সমবয়সী একটি ছেলের। রাস্তার অপর পার থেকে ছেলেটি তাকে লক্ষ্য করছিলো। তারপর ধীরে ধীরে সে তার কাছে এগিয়ে এলো। ক্রমে ক্রমে সে অলিভারের সাথে আলাপ জমিয়ে তুললো।

নবাগত ছেলেটি তার নাম বললো ডোয়াকিন্‌স্। এই ডোয়াকিন্‌সের মাধ্যমেই অলিভা এসে পড়লো এক পকেটমারের দলে। এক বুড়ো ইহুদী ছিলো এই পকেটমার দলের সর্দ্দার। সে লণ্ডন ও তার উপকণ্ঠের নানা শহরতলী থেকে নিরাশ্রয় ছেলে সংগ্রহ করতো। তারপর তাদের পকেটমারের কাজ শিক্ষা দিতো, শিক্ষা দিয়ে তাদের শহরে ছেড়ে দিতো। এই সব ছেলে পকেট মেরে যে টাকাপয়সা সংগ্রহ করে আনতো বুড়ো ফ্যাগিন তা নিতো। পরিবর্ত্তে সে তাদের খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড় সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দিতো।

ঘরে ঢুকেই অলিভার দেখতে পেলো কতকগুলো ছেলে; কয়েকজন তারই বয়সী, আর কেউ কেউ তার চেয়েও বয়সে বড়। এক জায়গায় বসে সবাই কি যেন খেলছে, আর ভারী হৈ-হল্লা করছে। একজন আর একজনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে, সাথে সাথেই একজন এসে তার হাত চেপে ধরছে। আর সবাই হৈ-চৈ করে উঠছে। তখন বেশ রাত্রি হয়ে গিয়েছিলো। সবাই খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অলিভার দেখতে পেলো বুড়ো ফ্যাগিন, ডোয়াকিন্‌স্ আর চার্লে বেট্‌স্ নামে আর একটি ছেলে, কাল যে খেলা সে ছেলেদের খেলতে দেখেছিলো, সেই রকম খেলা খেলছে। ফ্যাগিন তার নিজের পকেটে টাকাভরা একটি মানিব্যাগ রাখছিলো আর ছেলেদের ঐ ব্যাগটা হাত সাফাই করে পকেট থেকে তুলে নিতে বলছিলো। ঠিক এই খেলাটি যে কি নিরীহ অলিভার তা বুঝে উঠতে পারছিলো না। পরে একদিন এই খেলাটি অলিভারকে ফ্যাগিনের

কাছে শিখতে হোলো। তখনও অলিভার বোঝেনি যে ব্যাপারটি কি! যেদিন সে ব্যাপারটি বুঝলো, সেদিন সে মর্ম্মান্তিক ভাবেই বুঝলো।

এরপর একদিন ডোয়াকিন্‌স্ আর বেট্‌স্ অলিভারকে নিয়ে শহরে বেড়াতে বেরুলো। সেখানে এক বইয়ের দোকানে, এক বুড়ো ভদ্রলোক বই কিনছিলেন। বেট্‌স্ চুপি চুপি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে রুমালশুদ্ধ কতকগুলো টাকা উঠিয়ে নিয়ে পালালো। অলিভার ত ওদের কাণ্ড দেখে হতভম্ব! সে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করবে ভাবছিলো। এমন সময় ঐ ভদ্রলোক বইয়ের দাম দিতে গিয়ে তাঁর রুমালে-বাঁধা টাকা পকেটে নেই দেখে আশ্চর্য্য হলেন। এই ভদ্রলোকের নাম মিস্টার ব্রাউন্‌লো। ভদ্রলোক এজন্য হৈ-চৈ সুরু করলেন। অলিভার ভয় পেয়ে সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগলো। স্বভাবতঃই সবার সন্দেহ হোলো অলিভারই চোর। তারপর সবাই মিলে ওকে ধরে পুলিশের হাতে দিলো। মিস্টার ব্রাউন্‌লো ও বইয়ের দোকানের মালিকের সাক্ষীতে সে বিচারে খালাস পেলো।

মিস্টার ব্রাউন্‌লো ছিলেন খুবই ভালো মানুষ। তিনি অলিভারকে কোর্ট থেকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন। এবার অলিভারের জীবনে সুখের দিন নেমে এলো।

এদিকে ফ্যাগিন অলিভারের কোনো সন্ধান না পেয়ে ভারী চিন্তিত হোলো। সে ভাবল যে অলিভার যদি তাদের দলের কথা ফাঁস করে দেয় তবে পুলিশ তাদের দলশুদ্ধ সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।

তখন ফ্যাগিনের চিন্তা হোলো কি করে অলিভারকে খুঁজে পাওয়া যায়। একাজের জন্য সে তার দলের ন্যান্সী নামক একটি মেয়েকে লাগালো। মেয়েটি ছিলো ভারী সয়তান।

মিস্টার ব্রাউন্‌লো একদিন অলিভারকে একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বইয়ের দোকানে পাঠালেন বই কিনতে। তখন ন্যান্সী তাকে পথে দেখতে পেয়ে, তার সব লোকজন নিয়ে তাকে ধরে ফেললো, তারপর তাকে নিয়ে এলো ফ্যাগিনের আড্ডায়। এবার ফ্যাগিন তাকে খুব চোখে চোখে রাখতে লাগলো।

ফ্যাগিন আর তাকে কতদিন বসে বসে খাওয়াবে! সে তার লোকদের সাথে তাকে এক বড়লোকের বাড়ীতে চুরি করতে পাঠালো।

চোরের দল ঘরের মধ্যে ঢোকবার পর বাড়ীর লোকেরা টের পেয়ে গেলো। সুতরাং সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে দৌড়াতে লাগলো। দৌড়াতে দৌড়াতে অলিভার গিয়ে পড়লো একটা নর্দ্দামার ভেতরে। সে হাতপায়ে ভীষণ আঘাত পেলো এবং অচৈতন্য অবস্থায় সেখানে পড়ে রইলো। এরপর নামলো দারুণ বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে ভিজে অলিভারের জ্ঞান ফিরে এলো। তখন ভোর হয়ে গিয়েছিলো। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নর্দ্দামা থেকে উঠে এসে একটা বড় বাড়ীর সিঁড়ির ওপর বসলো। পরে অলিভার বুঝলো যে আগের রাত্রিতে এই বাড়ীতেই ওরা চুরি করতে ঢুকেছিলো।

এই বাড়ীতে থাকতেন মিসেস মেলি ও তাঁর পালিতা কন্যা রোজ। এঁরা শুধু ধনীই ছিলেন না এঁদের দয়াও ছিলো খুব বেশী। অলিভারের অবস্থা দেখে তাঁরা চিকিৎসক আনিয়ে তার চিকিৎসা করালেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে সেরে উঠলো। তারপর অলিভারের মুখে তার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাঁরা তাকে তাঁদের বাড়ীতেই রাখলেন এবং তার পড়াশুনার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

এখানে অলিভার বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলো।

ফ্যাগিন ও তার দলের লোকেরা কিন্তু অলিভারকে মুক্তি দিতে নারাজ ছিলো। সে যে এই বাড়ীতে আছে তাও তারা জানতে পেরেছিলো। এখান থেকেও তাকে তারা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু পারে নি। কয়েক দিন অলিভার ফ্যাগিন আর তার দলেরই অপর একজন দস্যুকে ঐ বাড়ীর পাশে ঘোরাফেরা করতেও দেখেছে। তাতে তার মনে মনে ভয় যে না হয়েছে তা-ও নয়।

এই বাড়ী থেকেই সে মিস্টার ব্রাউন্‌লোর বাড়ীর সন্ধান পেলো। সে রোজকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলো। ব্রাউন্‌লো খুব আদর করে অলিভারকে রাখলেন। কি ভাবে বই কিনতে গিয়ে, ওদের চক্রান্তে আবার ওদের দলেই পড়েছিলো অলিভার সেই কথা ব্রাউন্‌লোকে জানালো।

সব শুনে মাস্টার ব্রাউন্‌লো ভারী চটে গেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যে করেই হোক এই ফ্যাগিনের দলকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

এদিকে ন্যান্সীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিলো। সে অলিভারকে ঐ ভাবে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে ফ্যাগিনেম হাতে দেওয়ার জন্য তার মনে ভারী অনুশোচনা হয়েছিলো। সে এসেও মিসেস মেলিকে ফ্যাগিনের দলের সমস্ত খবর জানিয়ে দিলো। এ কথা জানতে পেরে ফ্যাগিনের দলের লোকেরা শেষ পর্য্যন্ত ন্যান্সীকে হত্যা করলো।

পুলিশ সন্ধান পেয়ে ওদের দলের পেছনেও লেগেছিলো। শেষ পর্য্যন্ত ওরা সবাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলো।

বিচারে ফ্যাগিনের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হোলো। বিচারের আগে যখন ফ্যাগিন জেলখানায় ছিলো, তখন তার মধ্যে পাগলামির ভাব প্রকাশ পায় এবং শেষ পর্য্যন্ত সে সাংঘাতিক পাগল হয়ে ওঠে।

পরে প্রকাশ পায় যে, অলিভার টুইস্ট ফ্যাগিনের দলের একজন লোক মঙ্কসের বৈমাত্রেয় ভাই। ওদের বাবার অনেক সম্পত্তি ছিলো, সেই সম্পত্তি থেকে অলিভারকে বঞ্চিত করবার জন্য ওকে বিপথগামী করবার উদ্দেশ্যে ফ্যাগিনের দলে এনে ভিড়িয়েছিলো। চরিত্র যদি খারাপ হয় তা হলে নিয়ম অনুযায়ী সে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। পরে আরও প্রকাশ পেলো যে রোজ হচ্ছে অলিভারের মায়ের আপন বোন।

অলিভার প্রথম থেকেই রোজকে বোন বলে মনে করতো। মাসী প্রকাশ হওয়ার পরেও তার পরিবর্ত্তন হোলো না।

তারপর অলিভার আর রোজ তাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ ও অতীতের অত্যাচারকে ভুলে গিয়ে সুখের পথে এগিয়ে চললো।

তোমাদের কাছে খুবই সংক্ষেপে অলিভার টুইস্টের গল্পটি বললাম। এই গল্পটি আগে তোমরা কেউ কেউ হয়ত পড়ে থাকবে। এখন বলছি এই গল্পের লেখক ইংরেজী কথা-সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল চার্লস্ ডিকেন্সের কথা।

ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস ডিকেন্স প্রথম শ্রেণীর গল্পকার হিসেবে স্বীকৃত। শুধু তাই নয়, শিশু-সাহিত্যেও তিনি শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর লেখা বইগুলো সর্ব্বত্রই জনপ্রিয়। তাঁর বইয়ের জনপ্রিয়তা পূর্ব্বেও যা ছিলো আজও সেই রকমই আছে, একটুও কমে নি। আজও ছেলে বুড়ো সবাই তাঁর লেখা বইগুলো সমান আগ্রহে পড়ে থাকে। পৃথিবীর বহু ভাষায় তাঁর বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর বইগুলো বিশ্বের সর্ব্বত্র সমান জনপ্রিয়।

বাংলায়ও তাঁর বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করেও তাঁর অনেক বই বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। তোমরাও নিশ্চয়ই তাঁর বই কিছু কিছু পড়ে থাকবে। অলিভার

টুইস্ট, ডেভিড কপারফিল্ড, ক্রীস্টমাস কেরোল, এ টেল অব টু সিটিজ—এ সব গ্রন্থের সব না হলেও, কোনো কোনোখানা নিশ্চয়ই তোমাদের পড়া আছে।

তিনি তাঁর রচিত অন্ততঃ পনেরোখানা বইয়ের এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো বিশ্ব-সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের যে চিত্র তাঁর উপন্যাস-গুলোতে তিনি এঁকেছেন, তা-ও এক কথায় বলতে হলে, বলতে হয় নিখুঁত। এ ধরণের নিখুঁত সমসাময়িক সামাজিক চিত্র খুব বেশী বইয়ে নেই।

বাস্তবের সাথে কল্পনার রং মিশিয়ে যে সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিকে মনে হয় যেন ওরা সবাই জীবন্ত নর-নারী, ওরা আমাদেরই প্রতিবেশী, আমাদেরই সব চোখে দেখা মানুষ। সে সব চরিত্রে ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তারা প্রায় সব দেশেই একই রকম চরিত্রের মানুষ। সুতরাং তাদের চিনে নিতে কোনো দে... পাঠক-পাঠিকারই কষ্ট হয় না। তাই তাঁর লেখা বই পড়বার সাথে সাথেই পাঠকে... রেখে যায়।

সাধারণ মানুষের কথা ও কাহিনী নিয়েই তিনি তাঁর গল্পগুলো লিখেছেন। ...ল্পের নায়ক-নায়িকা প্রায় সবাই সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ। এদের দুঃখ-দৈন্য, এদে... দের চরিত্রের দুর্ব্বলতা, ভালো মন্দ দুটো দিকই তিনি তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছে... প্রতি লেখক হয়েছেদ নির্ম্মম কঠোর, আবার কোথায়ও এদের প্রতি তিনি ক... বিগলিত হয়ে পড়েছেন। এমন নৈপুণ্যের সাথে তিনি এদের কথা বলেছেন ... লেখকের সাথে চলে গিয়েছেন কল্পনার রাজ্যে ওদের চিনে নিতে। লেখকের ব... পাঠক-পাঠিকার দলও চরিত্রগুলোর সমালোচনায় কঠোর হয়ে ওঠেন আবার ...ক্ষেত্রে তাদের হৃদয় থেকে করুণা বিগলিত হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। শক্তিশালী লেখকের সৃষ্টি করা মহৎ সাহিত্যে এসব গুণই বড় হয়ে দেখা দেয়।

তাঁর গল্পে রয়েছে তীব্র শ্লেষ, বিদ্রূপ, ব্য... কো... তা মারাত্মক নয়, ধ্বংসমূলকও নয়। প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি ছত্রে, দরদ যেন তাঁর ফো... সে যুগের সামাজিক অবিচারের ওপর তিনি যে তীব্র কষাঘাত করেছেন, বিত্তবান ... মানুষেরা গরীবের প্রতি যে নির্ম্মম অবহেলা দেখায়, তার যে চিত্র তিনি এঁকে...ন, এ যুগের মানুষেরাও সেগুলোকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়ে থাকে।

সে যুগের বিভিন্ন শ্রেণীর ...ষের স্বভাব-চরিত্র, আশা-আকাজ্ক্ষা কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। তাই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে অমন জীবন্ত।

ডিকেন্সের ছে...লা কেটেছিলো অত্যন্ত দুঃখের ভেতরে। দুঃখের দিনে যাঁরা তাঁর প্রতি সহানুভূতি... ড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের কথা কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তাঁর সুখের দিনে

তিনি ভোলেন নি, ঁর সাহিত্যের আসরে তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি তাঁদের সবার সামনে দাঁড় করিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের এসব চরিত্রেরও রয়েছে এক গৌরবপূর্ণ স্থান। চরিত্রগুলোও নানা দিক থেকে তাঁর রচনায় গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায়।

ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতিভা তাঁকে দুঃখজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী ইংল্যাণ্ডের পোর্টসমথের ল্যাণ্ড পোর্টে তাঁর জন্ম হয়। শেষ পর্য্যন্ত ডিকেন্স পরিবার চলে আসেন লণ্ডনে।

বাবা সাধারণ কাজ করতেন। খুবই আয়েসী আর আরামপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। পয়সা রোজগারের চেয়ে ব্যয়ের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশী। তাই ক্রমে ক্রমে তিনি হয়ে পড়েন গ্রস্ত। শেষ পর্য্যন্ত এই ঋণের দায় তাঁর কাঁধের ওপর এমন ভাবে চেপে বসলো যে গে তাঁকে যেতে হোলো দেওয়ানী ফাটকে। বালক ডিকেন্সের জীবনে নেমে সময়। এ সময়ে ডিকেন্সের জীবনে দৈন্যের আর অন্ত ছিলো না। মাত্র দশ বছ য়স। সেই বয়সেই তাঁকে কাজে বেরুতে হোলো। লেখাপড়া কিছুই জানা ছি ং কাজ যা হোলো তা অতি সাধারণ। এক ওষধ তৈরীর কারখানায় মজুরের বল লাগাতে হোতো তাঁকে। এ সময়ের বহু বিচিত্র দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁর াপাত করেছিলো যা সারা জীবন ধরে তিনি ভুলতে পারেন নি। পরবর্ত্তী রচনায় নায়ক-নায়িকা রূপে আমাদের সামনে এসে দেখা দিয়েছে।

কছু পরে তিনি ঐ কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে পড়াশুনো করতে সুরু করেন। সে সুযো অতি অল্প সময়ের জন্য পেয়েছিলেন। কিছু লেখাপড়া শেখবার পর তাঁর অফিসে কাজ করবার মত কতকটা যোগ্যতাও হোলো। তিনি এক এটর্নীর অফিসে চাকুরী নিলেন। এখানে চাকুরী করতে করতেই তি শিখলেন শর্টহ্যাণ্ড। তিনি পার্লামেন্টে যোগ দিলেন রিপোর্টার হিসেবে।

পরে তিনি লণ্ডনের কয়েকটি সংবা পোর্টার হিসেবে কাজ করেন। এই সময়ে তাঁর পরিচয় হয় লণ্ডনের বিচিত্র সমাজ-জীবনের সা এই অভিজ্ঞতাও তাঁর কথা-সাহিত্যের বহু বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টিতে নানা ভাবে সাহায্য করেছি

সমাজে যারা অবহেলিত, মানুষ হয়েও যারা সমা য়ের মর্য্যাদা পায় না, তাদের কথাই তাঁর রচিত সাহিত্যে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের দৈন শ্রমের ফল, এক শ্রেণীর মানুষের শোষণ করবার ফলে ঐ শোষণকারীরাই শুধু ভোগ করে, প্রকৃ শ্রমিকেরা তাদের দেহের ঘাম-ঝরানো শ্রমের ফল ভোগ করতে পারে না। এই কথাই নিখুঁতভা তিনি পাঠক-পাঠিকার সামনে উপস্থিত করেছেন।

'অলিভার টুইস্ট', 'ডেভিড কপারফিল্ড' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হোলো কি করে, কি অবস্থায় শিশুরা প্রথম জীবন থেকেই বিপথগামী হয়ে, দেশে সমাজবিরোধী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। সন্তানের প্রতি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পিতামাতা যে কতটা অকরুণ হয়ে উঠতে পারে, তাও তিনি খোলাখুলি ভাবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

তাঁর লেখা 'ক্রীস্টমাস ক্যারোল' একখানা অপূর্ব্ব বই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়দিনের আগে যখন তাঁর এই বইখানা প্রকাশিত হোলো, প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বইখানা বিক্রী হয়ে গেলো দু' হাজার কপি। অবশ্য সে-দিনে এই সংখ্যাই ছিলো আশাতীত বেশী। এই ছোট্ট বইখানা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বহুদিন পর্য্যন্ত সারা পৃথিবীতে এর জনপ্রিয়তা রক্ষা করে চলেছে।

'পিকউইক পেপারস্' তাঁর একখানা বিখ্যাত বই। এই বইয়ের অপূর্ব্ব ওয়েলার। সারা বিশ্বে আজও এই চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।

সমালোচকদের মতে তাঁর লেখা 'এ টেল অব টু সিটিজ'ই হচ্ছে সব দিক ফরাসী বিপ্লবের সূচনার পটভূমিকায় রচিত লণ্ডন ও প্যারিস এই দুই শহরের নিপুণ শিল্পীর মত এঁকেছেন যার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যাবে।

প্রাক্-বিপ্লব কালীন ফরাসী সমাজের অবস্থা,—প্রজাদের ওপর জমিদা অত্যাচার শেষ পর্য্যন্ত দেশের নরনারীকে কি ভাবে বিপ্লবের পথে—সাম্য, প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাই হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

তিনি তাঁর বইগুলো পড়ে জনসাধারণকে শোনাতেন। তাঁর পড়বার ভঙ্গীও ভারী চমৎ ছিলো। আমেরিকার কানাডা প্রভৃতি দেশে গিয়ে নানা শহরে তিনি তাঁর ব ড়ে জনসাধারণকে শুনিয়েছেন। কথক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, ডিকেন্সের স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ে পড়তে থাকে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলে ণ।

বিজ্ঞান-পত্র

॥ সঞ্জয় ॥

জেনে রাখো

একথা কি তোমরা জান, পৃথিবীতে ঠিক কতদিন আগে প্রথম জীবনের অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল? না না, জীবন মানে আজকের মানুষ, বাঘ, ভালুক, বানর, আমাদের জানা হাজারো প্রাণীর কথা বলছি না। আমি বলছি, পৃথিবীর আদিমতম জীবের কথা। সে সমস্ত জীব কবে পৃথি... মুছে গেছে বলা খুবই শক্ত। কবে পৃথিবীতে প্রথম জীবনের চিহ্ন দেখা দেয় তা নিয়ে ...বেষণা হয়ে গেছে। আজও হচ্ছে। কিছুদিন আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ...তুন সূত্র আবিষ্কার করেছেন। জীবাশ্ম কাকে বলে হয়ত অনেকেই তোমরা জান না তাদের জন্যে বলে রাখি, জীবাশ্ম হল পাথরের স্তরের মধ্যে ধরে রাখা অতি ...কপালা, প্রাণিদেহ প্রভৃতির অস্তিত্ব। পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে ...কর মাটি বাতাস আর জলের টানে ধুয়ে নেমে গেছে সাগরের নিচে। কখনও বা স্তরে স্তরে ধুয়ে আসা সেই মাটি এবং অন্যান্য পদার্থ সাগরজলের চাপ এবং ...পাথর হয়ে যায়। আর সে পাথর তৈরী হতে সময় লাগে লক্ষ কোটি বৎসর। ...র্ট পাথরের স্তূপের ওপর একটি প্রাণী মরে পড়ে রইল। পরে ঐ মৃতদেহের ওপর ...তেম... নূতন পাথরের স্তর। এই দুই স্তরের মাঝখানে ঐ প্রাণীর দেহ চাপা পড়ে রইল। তার মোটামুটি চেহারা, ... প্রভৃতি পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে নানা রকমের তথ্য বের করেন। এরাই হল জীবাশ্ম ... পাথরের বয়স মাপা আজ সম্ভব হয়েছে। অতএব বলে দেওয়া যেতে পারে কোন জীবাশ্ম কত ... । সেই সঙ্গে জীবাশ্মের স্বরূপও বলে দেওয়া যায়।

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বাস... ...ছ একধরণের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। খুব ছোট লাঠির মত—কতকটা ব্যাকটেরিয়ার মত দেখতে ... ...নিকদের অনুমান এর বয়েস প্রায় তিনশ' কোটি বৎসরের মত হবে। ১৯৬৫ সালের কেব... ...স প্রথম এই জীবাশ্মের কথা জানা যায়। পরে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করে হার্ভা... ...বিদ্যালয় ঐ সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন ডঃ এলসো এস... ...ঘুম। এর আগে ক্যানাডার দক্ষিণ ওনটারিওতে ঐ একই ধরণের জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার ...য়েস অনুমান করা হয় দুশ' কোটি বৎসর এবং তখন সেটাকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল বিশ্বের প্রাচীনতম প্রাণী ...জীবাশ্ম। এখানে জেনে রাখ, পৃথিবীর বয়েস মোটামুটি পাঁচশ' কোটি বৎসর।

এই গবেষক দলটি বারো কোটি বৎসরের পুরানো আর একটি জীবাশ্মের কথা উল্লেখ করেন। এই সময়েই নাকি জটিল বহুকোটি প্রাণীর অস্তিত্ব প্রথম প্রকাশ পায়।

* * * *

চুম্বকের সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকেরই পরিচয় আছে। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, আর ঝুলিয়ে রাখলে তার একটা দিক সব সময় উত্তর দিকে আর একটি দিক সব সময় দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে। একথাও হয়ত জান, আমাদের এই পৃথিবীটা একটি বিরাট চুম্বক। প্রচণ্ড,—প্রচণ্ড তার ক্ষমতা। কিন্তু পৃথিবীর চুম্বকের চেয়েও ৫০০,০০০ গুণ বেশী শক্তি সম্পন্ন চুম্বক তৈরী করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়-চুম্বক-বীক্ষণাগার। চুম্বকের ক্ষমতা মাপা হয় 'গস' নামে এক ধরণের এককে। কোন জিনিসকে যেমন আমরা গ্রাম বা কিলোগ্রামে ওজন করি, কোন পথের দূরত্ব যেমন আমরা মাইল বা গজে মেপে থাকি, চুম্বক-শক্তি মাপার সেই রকম একটি একক হল 'গস' পরীক্ষা করে দেখা গেছে পৃথিবীর চুম্বকের শক্তি প্রায় আধ 'গস'। আর মানুষের তৈরী সে ২২৫,০০০ 'গস'। ব্যাস দুই ফুট। উচ্চতা এক ফুট। একটার ওপর আর এক তিনটি বৈদ্যুতিক কয়েল দিয়ে এই চুম্বক তৈরী। এটিকে সক্রিয় রাখতে হলে বিদ্যুৎ এক কোটি ওয়াট। আর এত বেশী বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে কয়েলের তার যাতে গ কয়েলের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা জলের ধারা বইয়ে কয়েলটিকে গলনের হাত থে সেই জলের পরিমাণও কম নয়—মিনিটে দু হাজার গ্যালন।

* * * *

অনেকেই তোমরা মনে কর যত গোলমাল এই পৃথিবীতেই। মানে এই ক্ষারখানা, অর্থাৎ যেখানে মানুষ বেশী বাস করে। কলকাতা, পাটনা, দিল্লী—যেন জগতের হল্লার ভীড়। যারা শান্তিপ্রিয় এই হট্টগোল বা চেঁচামেচিতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তাই কোন কোন দেশে আজ পরিকল্পনা হচ্ছে, চলো একেবারে জলের নিচে নিয়ে শহর বানাই। সেখানে তোফা আরামে থাকা যাবে। প্রথমতঃ মাটির ওপরকার স তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। খাবার নেই, আরামে বাস করার জায়গার তারপর যুদ্ধবিগ্রহ, চেঁচামেচি—বিচ্ছিরি ব্যাপার।

অতএব—! না। গোলমাল, বাঁচিয়ে চলা অত সহজ ব্যাপার নয়। সাগরের নিচেও নয়। বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা খেছেন সারা পৃথিবীর ওপর গড়ে যে পরিমাণ হট্টগোল হয়ে থাকে তার তুলনায় সাগরের চে হট্টগোল অনেক বেশী। জনৈক গবেষক বলেছেন, সমুদ্রের মধ্যেও মনে হয়, যেন একটা বিরাট অফিসে টাইপরাইটার ফটফট শব্দ করছে, কারা যেন দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে, কাগজ র পটপট শব্দ, টেলিফোন বাজছে পুরো দমে। সমুদ্রের মধ্যে শোনা যায় জাহাজের শব্দ, জীবজন্তুর আওয়াজ, ঢেউএর সঙ্গে ঢেউএর ঘর্ষণ, ঢেউএর সঙ্গে সমুদ্রের

আঘাতের শব্দ। শাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি কটকট খসখস আওয়াজ তোলে। কোন কোন প্রাণী আবার ভূমিকম্প বা বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ড শব্দ তোলে যখন হঠাৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে চায়। তিমি মাছের শিস—এ সমস্ত মিলে সে এক তুলাকালাম কাণ্ড। অনেকে মনে করে, বিশেষ বিশেষ শব্দ তুলে অনেকে আবার নিজেদের মধ্যে নাকি কথাবার্তাও চালায়। আর যেহেতু জলে শব্দের গতিবেগ বাতাসের মধ্যেকার গতিবেগ থেকে প্রায় চার গুণ বেশী, অর্থাৎ বাতাসে যেখানে শব্দ সেকেণ্ডে ১,০৮০ ফুট যায় সেখানে জলে সেকেণ্ডে যায় ৪,৯২০ ফুট,—অতএব বুঝতেই পারছ সেই হট্টগোল কত দূর থেকে শোনা যেতে পারে।

সর্বত্রগামী গাড়ী—এই বিচিত্র যানটির উদ্ভাবন করেছে ক্যালোফোর্ণিয়ার ব্রাউন অটোমোটিভ কারখানার যন্ত্র-বিজ্ঞানীরা। এই যানটি যে কোন স্থানেও যাতায়াত করতে পারে। আটটি চাকার সাহায্যে গাড়ীটি চলে। চাকাগুলি খু ও নিম্নচাপের।

শরীরচর্চার বৈঠক

॥ বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় ॥

আমার ছোট ছোট ভাইবোন সব,

তোমরা সব ভাল আছো তো? বাপরে! কি গরমটাই না পড়েছে! আকাশে-বাতাসে যেন আগুন লেগেছে! খুব সাবধানে থাকবে আপাততঃ—অবশ্য মেঘ জমা হয়ে অঢেল জল পৃথিবীতে নেমে এলো বলে। তখন নিশ্চয়ই এই গরমে শরীরের অশান্তভাব থাকবে না, তবে একটা চিন্তা বেড়ে যাবে—অসুখ-বিসুখ, কলেরা-বসন্তের হাত থেকে তাই দূরে থাকার জন্য এখন থেকেই টিকা নেবার ব্যবস্থা কর। যখন তখন ঠাণ্ডা-গরম লাগাবে না—পেট পরিষ্কার রাখবে ত্রিফলার হাল্কা জোলাপ খেয়ে, যদি অবশ্য কোষ্ঠকাঠিন্য বোধ কর। আর নিয়মিত মোটামুটি যোগাসন অভ্যাস করে যাবে বা অল্প পরিমাণ খেলাধূলা করবে, কিন্তু খেলাধুলা করে এসেই যেন ঢক-ঢক করে ...
একটু বিশ্রাম নিয়ে খাবে, বুঝলে?

ঐতিহাসিক ২৫শে বৈশাখী উৎসব পুরাদমে শুরু হয়ে গেছে সারা বাং...
এদিকে আবার শুরু হয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন—এবার হচ্ছে কোলকাতার মার...
বরাবর নাচ গান যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদির মধ্যেই এই বঙ্গ সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ ...
কাণ্ড করে শরীর চর্চাকেও সংস্কৃতির মধ্যে স্বীকার করিয়ে নিয়েছি। এ চেষ্টা ...
থেকে চলছিল; কিন্তু "শরীর চর্চা" পর্বটিকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি বলে মেনে ...
যে কোন দিক থেকে মনের দুর্বলতা ছিল বুঝতে পারি নি। যাই হোক এবার ...
মানুষদের রেহাই দিই নি। দু'তিন দিন আমার ছাত্র-ছাত্রীদলের বিরাট শিক্ষামূলক ব্যা...ম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। তোমরা খোঁজখবর নিয়ে যদি সম্ভব হয় বাবা, মা, ভাই-বো...
এসো—হয়তো এমন অনেক জিনিস দেখতে, জানতে ও শিখতে পারবে- ... দেখতে
পুস্তকে কখনও পাও নি। তাছাড়া সুন্দর সুন্দর দেহী এবং তাঁদের ... সে জানা ও শিক্ষা বই
মনেও এক স্বপ্ন এসে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ছটফ... ত খা... ...ব খেলাধুলা দেখলে নিজের

এবার তোমাদের কিছু চিঠিপত্রের জবাব ... যাই হোক বলা রইলো—এসো।

... করে রেখো জবাবগুলি।

অমিয় চক্রবর্তী (রংপুর)। প্রঃ—অ... ...কে বহুমূত্র রোগ হয়—এ আমার জানা ছিল না, কিন্তু আমার হয়েছে। এখন কি করি, ...লিম ইন্‌জেক্‌শান নিয়েছি—কোন ফল পাচ্ছি না।

উঃ—তুমি নিয়মিতভাবে জানু... ..., ভুজঙ্গাসন, যোগমুদ্রা প্রতিটি ৫ বার করে সকাল-বিকাল নিয়মিত অভ্যাস করে যাও—নিশ্চয়ই ...ল ফল পাবে।

অরুণ দাস (বাঁকুড়া)। প্রঃ—শিশুসাথীতে জবাব পেয়ে খুশী হয়েছি, কিন্তু আপনি বলেছেন সপ্তাহে তিন দি... ...লতে, ২ দিন ব্যায়াম করতে অথচ ১ দিন না খেললে পা টন্‌টন্ করে, মাথা বন্‌বন্ করে ... ...—এর কি ব্যবস্থা হবে? প্রথম ব্যায়াম কি ডন-বৈঠক দিয়ে শুরু করব?

উঃ—ঐ জন্যই তোমার যত ছং বং স্মরণ হয়েছে। উল্টা-পাল্টা ব্যায়াম করলে অমনই হবে। ব্যায়ামের শুরু এবং শেষ কোনটাই ঠিক নয়; ব্যক্তিগত ভাবে জানাব—তা করলে ভাল ফল পাবে।

অসীম দত্ত (শান্তিপুর)। প্রঃ—চিঠিটি আমার Private. আচ্ছা বলতে পারেন কেন আমার অত গুঁড়া কৃমি হয়? খেলে ভাল হজম হয় না। পেট কামড়ায়। চোখের পাতা জ্বালা করে, চোখ লাল হয়, পিচুটি পড়ে—ভাল হবে তো?

উঃ—চিঠি যদি তোমার private-ই হয় তা হলে Post Card-এ লিখেছো কেন? তাছাড়া এ বয়সে private কথা ব্যবহার করবে কেন? মন খুলে বলার অভ্যাস না করলে মন শুদ্ধ হবে না। গুঁড়া কৃমি হয়েছে—তা, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ কর। ½ আউন্স ঝিনুক-চুণের জল সকালে খালিপেটে খাবে। হরীতকীর গুঁড়া জলে মিশিয়ে ছেঁকে নিয়ে সেই জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করবে।

…শী রায় চৌধুরী (পাটনা)। প্রঃ—কান আর গলা আমার খারাপ, কফের সঙ্গে রক্ত …গারগেল করি—কোন ফল হয় না। ডাক্তার দেখাতে ভয় হচ্ছে—কি করব?

…র্তে তুমি E. N. T. ডাক্তার দেখাও। রক্ত কালচার কর। নুনজলে গারগেল …লে ডেটল দিয়ে গারগেল করো। ডাক্তার দেখাতে তুমি ভয় পেয়ে চুপ করে থাকতে …বাবা-মা কেন এই ভয়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন?

…য় (কাঁথী)। প্রঃ—হোস্টেলে থেকে পড়ি। বাবা-মায়ের কত আশা আমি … কিন্তু কি যে হলো, পড়াশুনায় যত বেশী উচ্ছ্বসিত হচ্ছি—পড়তে বসে কত কি যে …ক না। এটা কি আমার স্বভাবের দোষ না দৈহিক কোন গণ্ডগোলের পরিণাম?

উঃ—কোনটাই নয়। তোমার মনঃসংযমের দোষ। সত্যি সত্যিই যদি তুমি জ্ঞানের সন্ধানে ঐ বই পু… …দ্ধ খুঁজে পাবার একান্ত আশা কর—নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী রূপে পাবে।

পরিমল দত্ত (…র্ধমান)। প্রঃ—বয়স সতেরো, উচ্চতা ৫´-৬´´, বুক ৩১´´, ওজন ৪৮ কেজি, কোষ্ঠকাঠিন্য আছে। সবল … …পতে কি করতে হবে,—এ বয়সে জাইঙ্গা পরতে পারি কি? কি ধরণের খাদ্য খাব? উত্তর দিন।

উঃ—দিচ্ছি। বৈশাখ সংখ্যায় … পত্রের উত্তরে যে খাদ্য-তালিকা দিয়েছি সেই অনুসারে খাবে। প্রকৃতির দেওয়া নিয়ম মেনে চ… । জাইঙ্গা নিশ্চয়ই পরতে পার, কিন্তু রাত্রে পরবে না। যে খাদ্য হজম করতে পার—তেমন খাদ্য … ওজন খুব কম, বুকের মাপও কম। ব্যায়াম কর খালি হাতে। যোগাসন হলে ভাল হয়।

দেবকুমার ভট্টাচার্য (দিল্লী)। প্রঃ—দৌড়লে হাঁপিয়ে …ই কেন? উচ্চতা বাড়ানো যাবে কেমন করে? বুক বড় হবে কি করে? ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় কি?

উঃ—সবাই হাঁপায়—আমিও। একটি শিশুর দেহ যেমন ক্রমশঃ … ওঠে তার জন্য কোন তোড়জোড় করতে হয় না—তোমারও তাই। ব্যায়াম কর—সকাল অথবা

প্রতাপ বসু (কলিকাতা)। প্রঃ—ডাক্তার বলেন আমায় সোয়াবীন খে—খেতে গিয়ে বমি করেছি। কি ব্যাপার বলুন তো ?

উঃ—অনেক আগে সোয়াবীন সম্বন্ধে শিশুসাথীতে বলেছি—খুঁজে দেখো।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (আসাম)। প্রঃ—বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় এবার কেউ যাচ্ছে কি এদেশ থেকে ?

উঃ—না—কেউ যাবার মত তৈরী নেই।

রমলা সেনগুপ্তা (কাছাড়)। প্রঃ—সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মুখে গন্ধ, তেতো, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ে। নিজেরই ঘেন্না লাগে—কি করি বলুন তো ? ভাল কথা—অ্যসন মোট ক'টি আছে ?

উঃ—রাত্রে খাবার পর দাঁত মেজে, জিব পরিষ্কার করে জল খেয়ে শোবে। হাল্‌কা খাবার রাত ৭॥টার মধ্যে খেয়ে নেবে, আঙ্গুল দিয়ে দাঁত ও মাড়ি মাজবে, ব্রাশ ব্যবহার আপাততঃ বন্ধ কর। মোটামুটি ৮৪টি আসন আছে আমার জানা।

আজ থাক—আবার পরের মাসে দেখা হবে। ইতি —তোমা

খেলাধূলা

॥ শ্রীঅমিতাভ ॥

১৯১১ সালের কোলকাতা। বাঙ্গালী ছেলেরা পার্কে পার্কে অথবা খো বল খেলে। বুটের রেওয়াজ তখনও চালু হয়নি। ভিজে মাঠই হোক, শুকনো ম পায়ে খেলার কৌশল বাঙ্গালী ছেলেরা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে ফেলেছে। দু-একটা দলের খেলার খ্যাতি বেশ ছড়িয়ে পড়ল। গোরা দলের সঙ্গে আই. এফ এ. শীল্ডের খেলায় পা সুযোগও তাদের জুটে গেল। সবার ওপর টেক্কা দিয়ে এক বাঙ্গালী দলই সেবার শীল্ড জিতল। এই দল যে বাংলার জনপ্রিয় মোহনবাগান দল তা কাউকে বলে দিতে হ। সে-দিনের সেই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়দের শেষ যোদ্ধা রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটা র ব জীবনের খেলা শেষ করে বিদায় নিলেন। আজ তাঁর জীবনের দু'চারটে কথা তো াই।

১৯১১ সালের ঐতিহাসিক শীল্ড-বিজয়ী গান দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন রেভারেণ্ড চ্যাটার্জি। তখনকার দিনে আই. এ ল্ড প্রতিযোগিতা ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল সম্মান। পেশোয়ার থেকে কুমারিকা পর্যন্ত যে ত মিলিটারী দল ছিল তারা সবাই এই খেলায় যোগদান করতে আসত। গোরাদের দাপটে র মাঠ গম-গম করত। তার মধ্যে টিম-টিম করত দু'একটা খালি পায়ের বাঙ্গালী দল। তার পর একটা মিলিটারী দলকে ঘায়েল করে এগিয়ে চলা সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড় মুখ রেফারীর পক্ষপাতিত্বের কথা ছেড়েই দিলাম। ১৯১১ সালে বাঙ্গালীর ফুটবল র্থক হ'ল। ফাইনালে ইস্ট ইয়র্ক দলকে হারিয়ে দিয়ে মোহনবাগান

ইতিহাস রচনা ক.। একটি সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল—"এতদিন আন্দোলন করে কংগ্রেসীরা যা করতে পারেনি, এগারো জন বাঙ্গালী যুবক তা সম্ভব করেছে।"

রেভারেণ্ড চ্যাটার্জি শুধু ভাল খেলোয়াড়ই ছিলেন তা নয়—তিনি লেখাপড়াতেও খুব ভাল ছিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাস করে উচ্চ শিক্ষার জন্যে তিনি ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ড অবস্থানকালে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একদিন একটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে যান। পথ ঠিক জানা না থাকায়—পৌঁছতে একটু দেরী হয়। প্রহরী জানাল—গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছে; আজ আর কিছু দেখা হবে না। কিন্তু রেভারেণ্ড চ্যাটার্জিকে অবাক করে দিয়ে প্রহরী বলল—"আজ তোমার অসুবিধার জন্যে আমি দুঃখিত। কাল তুমি ঠিক সময়ে এসো—আমি নিজে তোমায় সব জিনিস দেখাব। আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তুমি মোহনবাগান দলের চ্যাটার্জী। কাতায় মিলিটারীতে থাকতে তোমার বিপক্ষে খেলেছি।" সুদূর ইংলণ্ডে মোহনবাগানের দিন তাঁর বুক গর্বে ভরে উঠেছিল। রেঃ চ্যাটার্জির আত্মার শান্তি কামনা করি।

সনের ক্রিকেট এই কিছুদিন আগে শেষ হল ইডেন উদ্যানে। এই এপ্রিল মাসের মধ্যে একটানা পাঁচ ঘণ্টা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ক্রিকেট খেলা কি সোজা কথা? কিন্তু কষ্ট সহ্য না করে কোন উপায় ছিল না, কারণ আমাদের সি. এ. বি সময়মত খেলা তে পারেন নি। এবারের সি. এ. বি লীগ চ্যাম্পিয়ান হল মোহনবাগান বি. এন. র এবং সি.এ.বি নক আউট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হল স্পোর্টিং ইউনিয়ন বি. এন. করে।

হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান বি. এন. রেলদল এবারও অপরাজিত অবস্থায় লীগ-বিজয়ী হল। লীগের সম খেলায় বি. এন. রেল মাত্র দুটি পয়েন্ট অপচয় করে দুটি খেলায় ড্র করে। আর দুটি অপরাজিত দল মোহন এবং ইস্টার্ণ রেলের পয়েন্ট ছিল সমান, কিন্তু গোলের গড়পড়তায় মোহনবাগান লাভ করল রানার্স আপ স্থান।

বাইটন কাপের খেলা সুরু হয়ে ব অনেকগুলি খ্যাতনামা দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

এ বছরের ফুটবল লীগের খেলা শুরু হ'ল মে ম. ত তারিখে। এই বছর থেকে লীগের খেলাগুলি সত্তর মিনিট অনুষ্ঠিত হবে, ইতিপূর্বে এই ল পঞ্চাশ মিনিট। ফুটবল দলগুলিকে সত্তর মিনিট খেলা ভালভাবে রপ্ত করার জন্য আই. এফ. আগামী তিন বছরের জন্য লীগে ওঠা-নামা বন্ধ করে দিয়েছে। আগামী এক সংখ্যায় এই লীগে সম্বন্ধে আর লীগে ওঠা-নামা বন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কবিতার ধাঁধা

॥ পরিতোকুমার চন্দ্র ॥

নীচে কয়েকটি দু' লাইনের কবিতা দেওয়া হয়েছে। এগুলির মিলের শব্দের জায়গাগুলি ফাঁক রাখা হয়েছে। এর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা এক জোড়া করে মিলের শব্দ বসাতে হবে, যেমন :

খুখাই হোলো গাছে ওঠা, খুখাই কোমর কষা,
পেয়ারাটার নেই কোনো স্বাদ একেবারে কষা।

চেষ্টা করে দেখো না নীচের মিলের শব্দগুলি খুঁজে বের করতে পারো কিনা।

১। কি হোলো রে, অমন করে চলছিস মেরে —,
হাঁটতে যদি না পারিস তো চড় না গিয়ে —।

২। জেনে রাখিস্ আমার কথা মরদেরি —
মেলায় আমি যাবোই যাবো থাকনা আমার —।

৩। কেষ্টপুরের রথতলাতে বসেছে যে —,
বহু দোকান এসেছে আর লোক হয়েছে —।

৪। তর্ক থামা, পথের ওপর যেই রাখুক না —
তোকে যখন বলছি তখন তুই এটাকে —

৫। এমন করে অপরিষ্কার করলি যখন —,
এখন সোজা বল দেখি তুই মানবি কিনা —?

৬। শীঘ্র বলো কে নিয়েছ আমার যত —?
এখানে এই কৌটোটাতে ছিল এত —।

৭। বামুন দিদির গোরুটা রো
বেড়া যখন দাওনি তখন নে

৮। লোকের কথায় এলুম হেথ
একটা লোকের কাছেই

৯। ঘাটে বাঁধা ঐ রয়েে
চড়বি যদি কাদাটুকু

১০। এত করি বকা ঝকা, এত
তবুও তুই ছাড়লিনেকো ত নথ

১১। জানো যখন ওই টা জন্মাবধিই —,
তখন তা ণ করে উচিত কি ভাই —?
নৌক ণ গেছেই ছেড়ে লাভ কিছু নাই —,
া হয়ে বসো এখন যাবে পরের —।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

গত মাসের ধাঁধার র ও প্রতিযোগিতার ফল স্থানাভাবে প্রকাশ করা হল না। আগামী মাসে প্রকাশ করা হ লিপি সময়মত না পাওয়ায় এ মাসে 'নানা কথা' প্রকাশ করা সম্ভব হল না।
'নানা ক

সম্পাদিকার চিঠি

ছোটো বন্ধুরা,

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের খররৌদ্র সমস্ত দেশে যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র তৃষ্ণার জলের জন্য আকুলতা। মাত্র দু-একটি দিনের ক্ষীণবর্ষণ রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলিকে সরস করতে পারলো কোথায় ?

গত ২৫শে বৈশাখ আনুষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রস্মরণীর উদ্বোধন করা হল। জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রবীন্দ্রস্মরণীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল কবিগুরুর নিজের কণ্ঠে গাওয়া 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত।

৯ই মে ভারতের সর্বত্র গোখলে জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হল। ত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিলেন কৃষ্ণ গোখলে। মাত্র ৪৯ বছরের জীবনে জনসেবার এক বিরাট আদর্শ রেখে গোখলে ছিলেন বাংলাদেশের পরমাত্মীয়। ১৯০৫ সালে যখন লর্ড কার্জন বঙ্গ ন, তখন সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। মহামতি গোখলে সেদি ছিলেন। বাংলাদেশ এবং বাঙালী সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়—"What Ben day, India thinks tomorrow and world on the next day." ীতির উর্ধ্বে। এই পুণ্য জীবনের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা জানাই।

জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুলের জন্মদিন। একদিন সারা বাংলাদেশকে তিনি সুরের আজ সেই কবিকণ্ঠ নীরব। বিধাতা কবিকে রোগমুক্ত করুন, কবির শাণিত র দীপ্তি থেকে বিস্মৃতির কুয়াশা সরে যাক, এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমাদের কিছুই নেই।

রবীন্দ্র ৯০ উপলক্ষে কবিপক্ষে নৈহাটিতে একটি 'গল্প দৈনিক'এর আবির্ভাব হয়েছে। এছাড়া 'কবিতা দৈনিক' ং 'সান্ধ্য কবিতা দৈনিক'ও প্রকাশিত হয়েছে। এর পূর্বেই অবশ্য 'কবিতা ঘণ্টিকি'র (প্রতি ঘণ্টায় িত কবিতা পত্রিকা) আবির্ভাব এবং তিরোভাব ঘটে গেছে।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ ীতি ও শুভকামনা জেনো তোমরা।

শুভার্থিনী—তোমাদের সম্পাদিকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী দাশগুপ্ত
৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পরিবারের সবাই খুশী

দেশী গাছ গাছড়া থেকে আয়ুর্বেদ মতে তৈরী সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ ও সর্বপ্রকার দন্তরোগ দূর হয়, দাঁতের 'এনামেল' হয় শক্তিসম্পন্ন, দাঁত হয় সুস্থ, সবল ও ঝকঝকে। মুখে ফুটে ওঠে সুন্দর হাঁসি।

সাধনা দশন

সাধনা ঔষধা কা

৩৬, সাধনা রোড

সাধনা নগ কাতা ৪৮

ক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস (লণ্ডন), এম. সি. এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য।

শিশুসাথী

ছোটদের সেরা রুচিশীল মাসিকপত্র

এই বৈশাখে

৪৪ পার হয়ে ৪৫ বছরে পড়েছে

শিশুসাথী কখনো পুরানো হয় না—

শিশুর মতই শিশুসাথী চিরনূতন

ছোটদের মনের খোরাক জোগায় শিশুসাথী

কবিতাই নয়—ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, ম্যাজিক, ব্যায়াম, বুদ্ধির

ছবিতে গল্প, খেলাধূলা, তোমাদের পাতা, এ সবই থাকে শিশুসাথীর পাতায়।

খক আর শিল্পী তাঁদের লেখায় আর রেখায় সাজিয়ে দেন শিশুসাথীকে।

দিনের নাগরিককে ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে শিশুসাথী।

বক আর শিক্ষাবিদ্‌রাও ছোটদের জন্য শিশুসাথীকেই পছন্দ করেন।

এ বছরের শিশুসাথী রঙে রসে এক নিমেষেই

তোমাদের মন কেড়ে নেবে।

নিয়মিত বিভাগগুলির সঙ্গে নূতন বছরে সুরু হল—

* শ্রীযুক্ত ভৈর ‍াদ হালদারের তথ্যমূলক অ্যাডভেঞ্চার—"বরফের দেশ"

* কিংসূলী ফ ," অবলম্বনে শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী

—"কুপকুপ"

যারা এখনো গ্রাহক হও ‍া অবিলম্বে চাঁদা পাঠিয়ে

নূতন বছরের পত্রিকা নিশ্চিন্ত হও।

চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক ৫ টাকা ষাণ্মাসিক টা. ৫০ পঃ প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ

— বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড —

৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা